

আমি পিশাচ

॥ এক॥

আমি একজন পিশাচ। এ ছাড়া অন্য কোনও পরিচয় আমার নেই। কবে কীভাবে আমার জন্ম তা জানি না। আমার বয়েস কত তাও জানা নেই। শুধু জানি, রক্ত আমার একমাত্র খাদ্য। রক্তের পিপাসা আমাকে এক জায়গা থেকে আর-এক জায়গায় তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। এখনও যে পথ চলছি সেও ওই রক্তের টানে। পিপাসায় বুক শুকিয়ে আসছে আমার।

আমাকে কেমন দেখতে?

বলছি। তবে শুনে যেন অবাক হয়ে যেয়ো না।

আমার কোনও নির্দিষ্ট চেহারা নেই। যখন যেখানে থাকি সেইরকম চেহারা নিয়ে পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিই। যেমন, যখন জঙ্গলে থাকি তখন গাছের পাতা কিংবা গাছের বাকল হয়ে যাই। পুকুরপাড়ে থাকলে ঘাস-পাতা, আগাছা, কিংবা মাটির চেহারা নিই। এটা ছদ্মবেশ যদি বলো তো তাই।

ভিজে, স্যাঁতসেঁতে, নোংরা জায়গায় আমি থাকতে ভালোবাসি। তাই আমার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা হল মানুষ বা পশুর শরীর। ওদের শরীরের ভেতরটা নরম, স্যাঁতসেঁতে, দুর্গন্ধময়, নোংরা—আবার একইসঙ্গে রক্তের তাপে উষ্ণ। ওদের শরীরে আমি নিশ্চিন্তে বহুদিন থাকতে পারি। আর ওদের দিয়ে আমার রক্তের তৃষ্ণা মেটাই। আমার ইচ্ছেয় ওরা অন্যের শরীরে ধারালো দাঁত বসিয়ে রক্ত চুষে নেয়। ওরা বুঝতেও পারে না, ওরা আসলে আমার তেষ্টা মেটাচ্ছে। কারণ, ওদের শরীরে ঢুকে পড়ার পর থেকেই ওদের মস্তিষ্ক চলে আমার কথায়। অর্থাৎ, ওদের শরীর আর মন—দুই-ই দখল করে ফেলি আমি।

তবে পশুর চেয়ে মানুষই আমার বেশি পছন্দ। কারণ, মানুষের রক্তের

স্বাদ সবার সেরা। আর মানুষ শিকার করাও সহজ। তারপর, আমার হয়ে সেই মানুষ—কিংবা অমানুষ রক্তপিশাচ—যখন মানুষ শিকার করে, তখন তার কাজটাও সহজ হয়ে যায়।

আঃ! ভাবতেই কত তৃপ্তি!

কিন্তু এ-কাজে বিপদও আছে।

আমার দখলে থাকা অমানুষগুলো যখন ধরা পড়ে যায় তখন ওরা শাস্তি পায়। অন্যান্য সুস্থ মানুষ ওদের খতম করে। তখন আমাকে পালিয়ে বাঁচতে হয়। এক দেহের আশ্রয় ছেড়ে ছুটতে হয় অন্য আস্তানার খোঁজে।

বুঝতেই পারছ, মানুষ-পিশাচগুলোর বিনাশ হলেও আমার বিনাশ নেই।

তা হলে কি আমি অমর? কে জানে!

তবে আত্মা যদি অমর অবিনশ্বর হয় তা হলে প্রেতাত্মা কিংবা পিশাচের অমর হতে অসুবিধে কী!

পথ চলতে-চলতে যখন ভীষণ একঘেয়ে আর ক্লান্ত লাগছে ঠিক তখনই আকাশ ভেঙে বৃষ্টি নামল। সকাল থেকেই মেঘের সাজ-সাজ রব চোখে পড়েছিল, দুপুর পেরোতেই তার কান্নাকাটি শুরু হল।

চলতে আর ইচ্ছে করছিল না। তেষ্টায় আমার ভেতরটা ছটফট করছিল। তাই সামনের দোতলা বাড়িটায় ঢুকে পড়লাম।

প্রকাণ্ড বাড়ি। তার লাগোয়া খেলার মাঠ আর বাগান। মাঠে বর্ষার সবুজ ঘাস। কোথাও-কোথাও জল জমে আছে। ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছে। ওরা বোধহয় এই তুমুল বর্ষার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। এখন খুশিতে টগবগে হয়ে কলরোল শুরু করে দিয়েছে।

যাক, এবার আমার কাজ হল বিশ্রাম আর আরাম। আর তার জন্যে চাই একজন মানুষ—যার শরীরে আমি আশ্রয় নেব। তারপর...।

॥ দুই ॥

সত্যবানস্যার বোর্ডে অঙ্ক করছিলেন। কালো বোর্ডের ওপরে ওঁর চক-ধরা আঙুল তাড়াহুড়ো করে আলপনা এঁকে চলেছে। অঙ্ক যেন স্যারের পোষা পাখি। কী সুন্দর স্যারের কথা শোনে! কোনও অঙ্কই স্যারের আটকায় না। ধরেই স্যাটাস্যাট করে দেন। সেইজন্যেই অচ্যুত, ঋদ্ধিমান, বাসব, সৌরভরা সত্যবানস্যারের নাম দিয়েছে 'স্যাটাস্যাট'।

স্যার বোর্ডে অঙ্ক করছিলেন। আর ক্লাস নাইনের ছেলেরা মাথা নীচু করে চুপচাপ সেটা খাতায় টুকে নিচ্ছিল। অচ্যুত অঙ্কে দারুণ—সবসময় একশোয় একশো পায়। কিন্তু বীজগণিতের এই অঙ্কটা ওরও আটকে গেছে। হল অ্যান্ড নাইটের 'হায়ার অ্যালজেব্রা' থেকে এই অঙ্কটা স্যার আগের দিন করতে দিয়েছিলেন।

মাথা ঝুঁকিয়ে অঙ্ক টোকা শেষ হতেই কন্দর্প অচ্যুতকে আলতো করে খোঁচা মারল।

অচ্যুত পাশে ফিরে তাকাতেই কন্দর্প ফিসফিস করে বলল, 'অ্যাই, আমার ব্যাগ থেকে সাত টাকা চুরি গেছে।'

অচ্যুত অবাক হল না। কারণ, গত সাত-আটদিন ধরে ওদের সেকশানে এই চুরির ব্যাপারটা শুরু হয়েছে।

প্রথম যে-চুরিটা ওদের নজরে পড়েছিল সেটা ঋদ্ধিমানের ব্যাগ থেকে চার টাকা উধাও হওয়ার ঘটনা। সেটা ওরা কেউই খুব একটা আমল দেয়নি। ভেবেছে ঋদ্ধিমানের হয়তো ভুল হয়েছে। ভুল করে টাকাটা অন্য কোথাও রেখে এসেছে।

কিন্তু তারপর, ওদের বন্ধু কুলদীপের ব্যাগ থেকে বারো টাকা উধাও হতেই অচ্যুতরা নড়েচড়ে বসেছে।

ক্লাসে কুলদীপের গায়ের জোরই সবচেয়ে বেশি। ওর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে

কেউ পারে না। তা ছাড়া ও রোজ ব্যায়াম করে, বক্সিং ক্লাবে বক্সিং শেখে।

টাকা চুরি যেতেই কুলদীপ তো রেগে আগুন। ও সবাইকে শাসিয়ে বলল, 'চোর ধরা পড়লে এক ঘুষিতে নাক ফাটিয়ে বারো টাকার শোধ নেব।'

কিন্তু চুরির ব্যাপারটা থামল না। যেমন আজ কন্দর্পের টাকা চুরি গেছে। সুতরাং দুটো পিরিয়ডের ফাঁকে ওরা চার-পাঁচজন মিলে টিচার্স রুমে গিয়ে বাংলার অমিয়স্যারকে সব জানাল। স্যার কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, 'হাতেনাতে তস্করকে না ধরা পর্যন্ত তো কোনও প্রমাণ নেই! যদি তোরা নক্তচরকে লাল হাতে ধরতে পারিস, তা হলে প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে আদ্যোপান্ত অবধান করিয়ে শাস্তি দেওয়ার একটা ব্যবস্থা করা যেতে পারে।'

অচ্যুতরা আন্দাজ করতে পারল 'তস্কর' আর 'নক্তচর' মানে চোর। অমিয়স্যারকে নিয়ে এই এক মুশকিল! বাংলার স্যার বলে বড্ড বেশি বাংলায় কথা বলেন।

পরদিন থেকে ওরা পাঁচজন—অচ্যুত, কুলদীপ, প্রতীক, বাসব, আর সৌরভ—চোর ধরার নানান মতলব আঁটতে লাগল।

এসব ব্যাপারে কুলদীপ ওদের লিডার। আর প্রতীক কুলদীপের সর্বক্ষণের সাথী। মাঝে-মাঝে কুলদীপকে দুষ্টু বুদ্ধির জোগান দেয় বলে প্রতীকের একটু কুখ্যাতি আছে। বাসব ক্লাসের মনিটর, এন. সি. সি.-র ক্যাডেট। ডিসিপ্লিন নিয়ে সবসময় মাথা ঘামায়। হাঁটা-চলা করে সৈনিকের ঢঙে—যেন লেফ্‌ট-রাইট করে প্যারেড করছে। ক্লাসের অনেকেই ওর হাঁটার ঢং নকল করে ওকে ব্যঙ্গ করে—তবে আড়ালে। নইলে ও স্যারদের কাছে কমপ্লেন করে দেবে। আর যেহেতু সৌরভের ব্যাগ থেকে চব্বিশ টাকা চুরি গিয়েছিল, তাই চোর ধরার মতলবে ও একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টিফিনের সময় স্কুলের লাগোয়া খেলার মাঠে জামগাছতলায় বসে ওদের প্ল্যান আঁটার কাজ শুরু হল।

টিফিনের সময় অচ্যুতরা বেশিরভাগই ক্লাসরুম ছেড়ে খেলার মাঠে বেরিয়ে আসে। টিফিনটা কোনওরকমে নাকে-মুখে গুঁজে ওদের কলরোল খেলাধুলো শুরু হয়। ওদের চেঁচামেচিতে গাছে বসে থাকা বুলবুলি, শালিখ, বসন্তবৌরি আর দোয়েল পাখিরা উড়ে পালায়। আধঘণ্টা পর ক্লাস বসলে মাঠটা হঠাৎ আবার ফাঁকা নির্জন হয়ে যায়। তখন পাখিরা বোধহয় হাঁফ

ছেড়ে ফিরে আসে।

চুরির ঘটনাগুলো খতিয়ে বিচার করার পর প্রতীক বলল, 'স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, টাকাটা যে নেয় সে টিফিনের সময় নেয়। ক্লাসে তখন যদি অন্যরা কেউ বসে থাকে তা হলে নেয় না। কিন্তু ফাঁক পেলেই ব্যাগ হাতড়ায়। টিফিনের সময় ক্লাসরুমটা ওয়াচ করতে হবে।'

তখন ঠিক হল, রোজ টিফিনের সময় সৌরভ ওদের ক্লাসরুমে ডেস্কের নীচে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে থাকবে। ক্লাসে কেউ ঢুকলে সৌরভকে দেখতে পাবে না। ফলে চোরবাবাজি ধরা পড়বেই।

যেমন মতলব তেমনি কাজ। এবং ফল পাওয়া গেল তিনদিনের মধ্যেই।

সৌরভ ক্লাসরুমে লুকিয়ে ছিল। ওদের ক্লাসে দুটো করে ডেস্ক পাশাপাশি তক্তা দিয়ে জুড়ে দুজনের বসার মতো ব্যবস্থা করা আছে। সেই জোড়া ডেস্কগুলোকে আবার পাশাপাশি সাজিয়ে ডেস্কের সারি তৈরি করা হয়েছে। আর ক্লাসরুমের মাঝ-বরাবর রয়েছে যাতায়াতের প্যাসেজ।

সৌরভ ক্লাসরুমের একেবারে শেষে এককোণে একটা জোড়া ডেস্কের নীচে লুকিয়ে ছিল। অত বড় ঘরে আর কেউ নেই। সব চুপচাপ। শুধু তিনটে সিলিং ফ্যান ঘোরার শব্দ হচ্ছে। ঘাড় গুঁজে বসে থাকতে সৌরভের বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু একটা জেদ ওকে দিয়ে এই কষ্ট সইয়ে নিচ্ছিল।

আগের দু-দিন কোনও ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু আজ ঘটল।

মিনিটদশেক যেতে না যেতেই একজোড়া পা দেখতে পেল সৌরভ।

খুব সাবধানে দুটো ডেস্কের পায়ার একচিলতে ফাঁক দিয়ে ও উঁকি মারল। দেখল, ওদেরই ক্লাসের রাজীব দাস প্রথম সারির ডেস্কের ব্যাগগুলো ব্যস্তভাবে হাতড়াচ্ছে। কোনও-কোনও ব্যাগের ভেতর থেকে কী যেন মুঠো করে নিয়ে পকেটে ঢোকাচ্ছে। আর মাঝে-মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে ক্লাসরুমের দরজার দিকে তাকাচ্ছে।

মাত্র পাঁচমিনিট। তার মধ্যেই দুটো ডেস্কের সারির তল্লাশি চটপট সেরে ফেলল রাজীব। যা পেল পকেটে গুছিয়ে নিল। তারপর তাড়াহুড়ো করে ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।

না, সৌরভ 'চোর, চোর' বলে চেঁচায়নি। কারণ, সেইরকমই কথা ছিল। ও শুধু চুরির ঘটনাটা কুলদীপ, অচ্যুতদের জানিয়ে দিল। বলল, এই কুকীর্তি কার।

এই খবরটা জানার পর কুলদীপরা চো. ধরার ফাঁদ পাতল। ওরা পাঁচজন টিফিনের সময় ক্লাসরুমের পাঁচ জায়গায় ডেস্কের নিচে ঘাপটি মেরে রইল।

ওদের হতাশ হতে হল না। কারণ, চোর এল এবং চটপট কাজ সারতে লাগল।

কুলদীপ সকলের আগে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এল। ওর পিঠের ধাক্কায় একজোড়া ডেস্ক দড়াম করে মেঝেতে উলটে পড়ল।

ও চিৎকার করে রাজীবকে জাপটে ধরল, 'ব্যাটা চোর, রোজ বন্ধুদের টাকা চুরি করিস—লজ্জা করে না!'

ততক্ষণে সৌরভ, বাসব, প্রতীক আর অচ্যুত ওদের লুকোনো জায়গা থেকে বেরিয়ে এসেছে। ওরা সবাই রাজীবকে ঘিরে ধরল। তারপর রাজীবকে টানতে-টানতে নিয়ে গেল টিচার্স রুমে।

এখন টিফিনের সময়। একটা প্রকাণ্ড টেবিল ঘিরে স্যারেরা বসেছিলেন। কয়েকজন গল্পগুজব করছিলেন, কেউ-কেউ টিফিন সারছিলেন। বেয়ারা সেবকরাম একপাশে দাঁড়িয়ে চক-ডাস্টার গুছিয়ে রাখছিল।

টিচার্স রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে কুলদীপরা চট করে ঘরের ভেতরটায় চোখ বুলিয়ে নিল। ওদের ক্লাসটিচার ভূগোলের কালীপদস্যারকে ওরা দেখতে পেল না। বোধহয় কোনও কাজে বাইরে বেরিয়েছেন। তবে অমিয়স্যার আর সত্যবানস্যার ছিলেন। সত্যবানস্যার টিফিন করছিলেন। আর অমিয়স্যার খবরের কাগজ পড়ছিলেন।

টিচার্স রুমের দরজায় ওদের জটলা দেখে কেউ-কেউ অবাক হয়ে দেখছিলেন।

বাসব অমিয়স্যারের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভেতরে আসব, স্যার?'

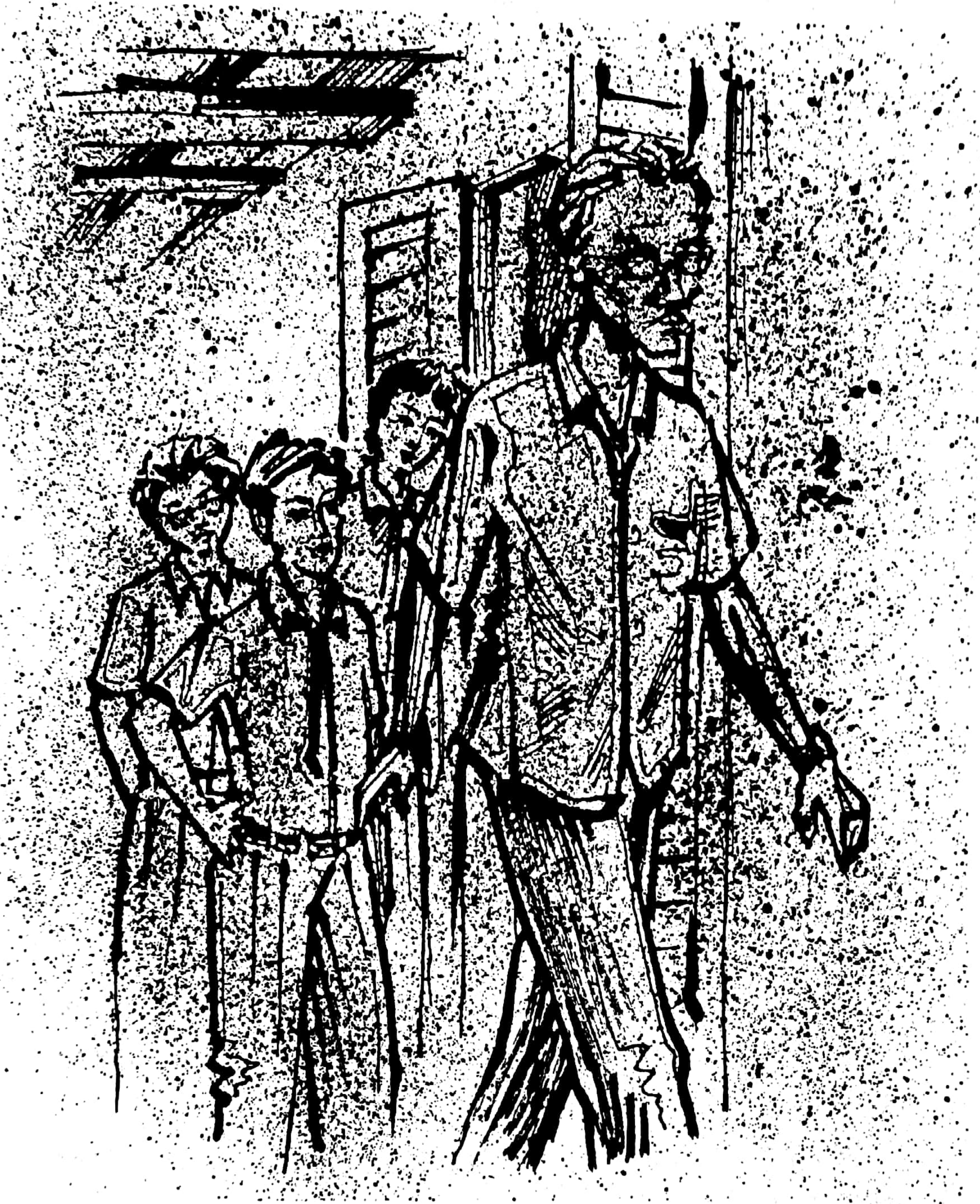
অমিয়স্যার কাগজ থেকে মুখ তুলে দরজার দিকে তাকালেন। কুলদীপ, সৌরভ, বাসবদের দেখে বুঝলেন কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। কারণ, কুলদীপ রাজীবের কবজি শক্ত করে চেপে ধরে ছিল।

চেয়ার ঠেলে সরিয়ে উঠে দাঁড়ালেন অমিয়স্যার। খবরের কাগজটা একটা ডাস্টার চাপা দিয়ে রেখে চটপট চলে এলেন দরজার কাছে।

'কী রে, কী হয়েছে!'

ওরা হাঁফাতে-হাঁফাতে রাজীব দাসের কীর্তির কথা বলল।

অমিয়স্যার ধৈর্য ধরে সব শুনলেন। ব্যাপারটা ওঁর মনে পড়ে গেল।



...এমন সময় সত্যবান স্যার ওদের পাশ দিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

তিনিই ওদের বলেছিলেন চোরকে হাতেনাতে ধরার কথা।

তিনি রাজীবকে বললেন, 'তুই এখানে থাক।' তারপর অচ্যুতদের দিকে ফিরে : 'তোরা শ্রেণিতে যা। আমি ব্যাপারটা দেখছি—।'

এমন সময় সত্যবানস্যার ওদের পাশ দিয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু আশ্চর্য, ওদের জটলা নিয়ে কোনওরকম কৌতূহল দেখালেন না। একজন অচেনা মানুষের মতো পাশ দিয়ে চলে গেলেন। অথচ দু-তিনদিন আগেও অচ্যুতকে দেখলে হেসে বলতেন, 'কী রে, দিনরাত শুধু ক্রিকেট নিয়ে পড়ে আছিস, নাকি অঙ্ক-টঙ্কও একটু-আধটু হচ্ছে? ভালো করে পড়। মাধ্যমিকে অঙ্কে একশোয় একশো পাওয়া চাই-ই চাই।'

অচ্যুত বেশ অবাক হয়ে গেল। কয়েক সেকেন্ড ধরে ও সত্যবানস্যারের চলে যাওয়া দেখল।

আর ঠিক তখনই টিফিন শেষ হওয়ার ঘণ্টা বেজে উঠল। ঢং-ঢং-ঢং-ঢং। স্কুলের দারোয়ান বানজারা পূর্ণিমার চাঁদের মতো গোল পিতলের ঘণ্টায় কাঠের হাতুড়ি দিয়ে তাল ঠুকে জানিয়ে দিচ্ছে টিফিনের আধঘণ্টা শেষ হয়েছে। এখন আবার ক্লাস শুরু হবে।

ক্লাস ফোর-ফাইভে পড়ার সময় অচ্যুতের এরকম একটা পিতলের ঘণ্টা কেনার খুব শখ হয়েছিল। কিন্তু বাপি আর মা সেই শখের কথাটা শুনে হেসে এমন গড়িয়ে পড়েছিল যে, অচ্যুতের আর ঘণ্টা কেনা হয়ে ওঠেনি।

স্কুলের চওড়া বারান্দা ধরে ওরা ক্লাসের দিকে ফিরে যাচ্ছিল। এখন দুপুর হলেও আকাশ মেঘলা। যখন-তখন বৃষ্টি হতে পারে। গত ক'দিন ধরেই ঝেঁপে বৃষ্টি চলছে। মাঝে-মাঝে এক-আধঘণ্টার বিরতি। বৃষ্টিও বোধহয় তখন টিফিন করতে যায়—নয়তো ঘুমিয়ে পড়ে।

স্কুলের মাঠটা বৃষ্টিতে যাচ্ছেতাই হয়ে থাকে বলে এখন টিফিনের সময়ে খেলার হুল্লোড় অনেকটা মিইয়ে গেছে। আর সবসময় মেঘলা থাকলে অচ্যুতের কেমন যেন মনখারাপ লাগে।

ফিফ্‌থ পিরিয়ডের দশ-পনেরো মিনিট পেরিয়ে যাওয়ার পর রাজীব ক্লাসে এসে ঢুকল।

রমেশস্যার তখন ইতিহাস পড়াচ্ছিলেন, আর ক্লাসের অর্ধেক ছেলে তন্দ্রার টানে ঢুলছিল। ঘন-ঘন হাই উঠছিল সকলের।

কিন্তু রাজীব দাসকে দেখেই সবাই সোজা হয়ে বসল।

রাজীবের রং টকটকে ফরসা। ঘি-মাখন খাওয়া গোলগাল নধর চেহারা। চোখে চশমা। সবসময় ফিটফাট থাকে। কিন্তু এখন ওর চুল উসকোখুসকো, চোখের জল চশমার ফাঁক দিয়ে গাল বেয়ে নেমে এসেছে, হেঁচকি তুলে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

রমেশস্যার দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন সাম্রাজ্যের সাতকাহন থামিয়ে অবাক হয়ে জিগ্যেস করলেন, 'কী ব্যাপার? তুই কোথায় গিয়েছিলি?'

প্রশ্নটা করে কুতকুতে তীক্ষ্ণ চোখে তিনি রাজীবকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিলেন।

'অমিয়স্যার আমাকে হেডস্যারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন।' ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল রাজীব।

'কেন রে? কী করেছিস তুই?'

রাজীব চুপ করে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

অচ্যুতের ভীষণ খারাপ লাগছিল। আহা রে! হেডস্যার মোহনলালবাবু নিশ্চয়ই ওকে বেত দিয়ে মেরেছেন। কিন্তু রাজীবই-বা টাকা চুরি করে কেন? ওরা তো বেশ বড়লোক! রেল স্টেশনের কাছে ওদের সুন্দর দোতলা বাড়ি। মারুতি জেন গাড়ি করে স্কুলে আসে।

মনিটর বাসবকে ডেকে রমেশস্যার ব্যাপারটা জানতে চাইলেন। রাজীবকে বললেন, 'তুই ডেস্কে গিয়ে বোস।'

রাজীব মাথা নীচু করে ডেস্কের দিকে এগোল।

অচ্যুতের ডেস্কের সারির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় রাজীব ওকে মিনমিনে গলায় বলল, 'ছুটির পর তোকে অমিয়স্যার দেখা করতে বলেছেন।'

অচ্যুত ঘাড় নেড়ে 'আচ্ছা' বলল।

রমেশস্যার বাসবের কাছে গোটা গল্পটা শুনে তারপর আবার সাতবাহন রাজবংশের কাহিনি শুরু করলেন।

রমেশস্যারের পিরিয়ড শেষ হতেই সবাই রাজীবকে ছেঁকে ধরল। কেউ-কেউ ওকে সান্ত্বনা দিল। আবার কেউ বলল, 'ঠিক হয়েছে—অন্যায় করেছে তাই শাস্তি পেয়েছে।'

কলদীপ, সৌরভ, বাসবরা খুঁটিয়ে জানতে চাইল অমিয়স্যার ওকে হেডস্যারের কাছে নিয়ে যাওয়ার পর ঠিক কী-কী হয়েছে।

রাজীব থতিয়ে-থতিয়ে বলছিল আর ফুঁপিয়ে উঠছিল। হেডস্যারের দশ

ঘা বেতের বাড়ি খেয়ে ও সহ্য করেছে। কিন্তু হেডস্যার বলেছেন, কাল ওর বাবা-মাকে স্কুলে এসে দেখা করতে। এটা ওকে ভীষণ ভয় পাইয়ে দিয়েছে। বাপি-মাম্মি এসব ঘটনা জানতে পারলে ওকে হয়তো বাড়ি থেকেই বের করে দেবে। রাজীব তাই ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে সিঁটিয়ে গেছে।

কুলদীপদের ভীষণ মনখারাপ হয়ে গেল। ওরা রাজীবকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'দাঁড়া, দেখছি কী করা যায়। তুই চিন্তা করিস না।'

সব শুনে অচ্যুত বলল, 'অমিয়স্যার তো আমাকে ছুটির পর ডেকেছেন। তখন আমি স্যারকে বলব। হেডস্যারকে যেন রিকোয়েস্ট করেন—যাতে গার্জেন কল না হয়।'

অচ্যুতের কথায় রাজীব তেমন ভরসা পেল বলে মনে হল না।

চারটে বেজে দশমিনিটে বানজারা ছুটির ঘণ্টা বাজাল।

বই-খাতা গুছিয়ে নিয়ে নানান ক্লাসের ছেলের দল পিলপিল করে বেরিয়ে এল ক্লাসরুমের বাইরে। তারপর স্কুল-বাড়ি ছেড়ে মাঠে নেমে এল 'সাদা জামা কালো প্যান্টের' ভিড়। সেখান থেকে সদরের লোহার গেট। আবার গেট পেরিয়ে রাস্তা।

আকাশ মেঘে কালো হয়ে এসেছে। এখনই বোধহয় আবার বৃষ্টি নামবে।

স্কুলের মাঠের একপাশে সারে-সারে দাঁড় করানো সাইকেল। এক ঝাঁক ছেলে হইহই করে ছুটল সাইকেলের দিকে। নীচু ক্লাসের কয়েকটা ছেলে জল-কাদাভরা মাঠে ছুটোছুটি করে খেলতে লাগল। মাঠের এখানে-ওখানে জমে থাকা জলের ওপর পা ফেলে দাপিয়ে ছুটে গিয়ে কাদা-জল ছিটকে দিতে লাগল চারপাশে।

সদরের গেটের বাইরে বাবা-মায়েদের ভিড়। তাঁদের চোখ সাদা-কালো পোশাকের ভিড়ে নিজের-নিজের ছেলেকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

স্কুল ছুটির সময় এই ভাঙাচোরা সরু রাস্তাটা সাইকেল, সাইকেল রিকশা আর স্কুটারে ছয়লাপ হয়ে যায়। যানজট চলে অন্তত আধঘণ্টা। এখন, বর্ষার সময়, তাই অবস্থা একেবারে বেহাল।

স্কুল ছুটি হয়ে গেলেও অচ্যুতরা কয়েকজন ক্লাস থেকে বেরোয়নি। অমিয়স্যারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে রাজীবের ব্যাপারে অচ্যুত ঠিক কী-কী বলবে তাই নিয়েই জল্পনা-কল্পনা চলছিল। রাজীব কুলদীপ-অচ্যুতদের হাত ধরে একেবারে কেঁদে পড়ল ঃ 'তোরা আমাকে যেভাবে হোক সেভ কর।'

প্রায় আধঘণ্টা পর ওরা ক্লাসরুম থেকে বেরোল।

কুলদীপরা সবাই চলে গেল। পিঠে বই-খাতার ব্যাগ ঝুলিয়ে অচ্যুত একা রওনা হল টিচার্স রুমের দিকে। যাওয়ার আগে ও কুলদীপকে বলল, 'রাজীবের ব্যাপারে অমিয়স্যারের সঙ্গে কী কথা হল আমি তোকে রাতে ফোন করে জানাব। টা-টা।'

অচ্যুত খেয়াল করেনি কখন যেন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। একটু আগের হুল্লোড় হইচই থেমে গিয়ে এখন সব একেবারে নিঝুম। শুধু বৃষ্টি ঝিরঝির করে পড়ছে। বাইরে কলাগাছের পাতায় বৃষ্টির ফোঁটার টপটপ শব্দ হচ্ছে। দূর থেকে সাইকেল রিকশার 'প্যাকপ্যাঁক' ডাক শোনা যাচ্ছে। আর কখনও-কখনও মেঘের 'গুড়ুম-গুড়ুম'।

ছুটির পর স্কুল থেকে সবাই চলে যায়। তখন বানজারা স্কুলের সব ঘর ঘুরে-ঘুরে আলো আর পাখা অফ করে, দরজায়-দরজায় তালা দেয়। তারপর স্কুল বিল্ডিং-এর কোলাপসিব্‌ল গেটে তালা দিয়ে নিজের ঘরে যায়। ওর ছোট্ট ঘর স্কুল-বাড়ির লাগোয়া, অ্যাসবেস্টসের ছাউনি দেওয়া। পাশেই একটা টিউবওয়েল। আর তাকে ঘিরে নানান গাছপালা। বর্ষায় সেগুলো সব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

টিউবওয়েল থেকে একটু দূরেই একটা ছোট গোয়ালঘর। সেখানে বানজারার পোষা গোরু রামুয়া আর ছোট একটা বাছুর আছে। ওরা বেশিরভাগ সময়েই মাঠে ঘুরে বেড়ায়, ঘাস-পাতা খায়।

বানজারা বউ নিয়ে থাকে। ওর বউ স্কুলের সুইপারের কাজ করে। সবসময় পান খায়, আর মাথায় ঘোমটা টেনে থাকে।

টিচার্স রুমের দিকে হেঁটে যাওয়ার সময় অচ্যুতের বুটজুতোর খটখট শব্দ করিডরে কেমন যেন ফাঁপা প্রতিধ্বনি তুলছিল। একতলা থেকে দরজা বন্ধ করার শব্দ শোনা যাচ্ছিল। বানজারা ওর কাজ শুরু করে দিয়েছে।

টিচার্স রুমের কাছে এসে অচ্যুত অবাক হয়ে গেল। ঘর খাঁ-খাঁ করছে। কেউ নেই।

ঘরে আলো জ্বলছে, পাখা ঘুরছে। খোলা জানলা দিয়ে ঘোর কালো মেঘ, গাছপালা আর বৃষ্টি চোখে পড়ছে। দেওয়ালে ঝোলানো ক্যালেন্ডারের পাতা হাওয়ায় উড়ছে।

তা হলে কি বৃষ্টি আসার ভয়ে অমিয়স্যার একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেছেন?

এমন সময় একটা শব্দ অচ্যুতের কানে এল।

মেঝেতে খুচরো পয়সা পড়ে যাওয়ার শব্দ।

টিচার্স রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে চোখ সরু করে নজর ধারালো করল অচ্যুত। সামান্য কুঁজো হয়ে টেবিলের নীচ দিয়ে দেখতে চেষ্টা করল।

খুচরো পয়সা কোথায় পড়ল? কার পকেট থেকে পড়ল?

ঝুঁকে পড়ে নীচু হতেই এক অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পেল অচ্যুত।

সত্যবানস্যার দেওয়ালের গায়ে টিকটিকির মতো হেঁটে বেড়াচ্ছেন।

মেঝে থেকে অন্তত হাতদুয়েক ওপরে মেঝের সঙ্গে সমান্তরালভাবে স্যারের শরীরটা আঠার মতো আটকে রয়েছে। ঠিক সাঁতার দেওয়ার ভঙ্গিতে তিনি এগিয়ে চলেছেন।

এরকম একটা মজার দৃশ্য দেখে অচ্যুতের হাসি পাওয়ার কথা। কিন্তু ও ভয় পেল। ওর হাত-পা ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল, বুকের ভেতরে বাতাস আটকে গেল। কারণ, সত্যবানস্যারের মুখে এক অদ্ভুত নিষ্ঠুর উল্লাস। ঠোঁটজোড়া লাল টুকটুক করছে, চোখে এক অলৌকিক সবুজ আলো।

আর ঠিক তখনই কড়-কড় কড়াৎ শব্দে বাজ পড়ল কোথাও। অচ্যুত চমকে উঠল। ওই অবস্থাতেও ও বুঝতে পারল খুচরো পয়সাগুলো স্যারের পকেট থেকেই পড়েছে।

এরকম একটা বিচিত্র ভয়ঙ্কর দৃশ্য অচ্যুতকে পাগল করে দিল। ও হেঁচকি তুলে শ্বাস টানল, বুক ভরে বাতাস নিতে চাইল। তারপরই ছুট লাগাল দোতলার বারান্দা ধরে। ওর বুটের শব্দ শুনে মনে হচ্ছিল কোনও পাগলা ঘোড়া মৃত্যুভয়ে ছুটে পালাচ্ছে।

অচ্যুত যদি পিছন ফিরে তাকাত তা হলে দেখতে পেত সত্যবানস্যার ওর হেঁচকির শব্দে দেওয়ালের গা থেকেই মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছেন। সবুজ আগুনভরা চোখে ওর ছুটে পালানো দেখছেন।

আর স্যারের ঠোঁটের কোণে এক চিলতে রহস্যময় হাসি।

॥ তিন ॥

পরদিন সাইকেল চালিয়ে স্কুলের গেটে পৌঁছে অচ্যুতের মনে হচ্ছিল গতকাল ও যা দেখেছে সবটাই স্বপ্ন—অথবা দুঃস্বপ্ন।

রং-চটা সীমানা-পাঁচিলের গায়ে বসানো জং-ধরা লোহার গেটের একটা পাল্লা খোলা। অচ্যুত সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। তারপর সাইকেলটা হাঁটিয়ে ভেতরে ঢুকল।

মাঠের এখানে-সেখানে বৃষ্টির জল জমে রয়েছে। মাঝখানের খানিকটা ফাঁকা জায়গা বাদ দিলে মাঠের বাকি অংশে বড়-বড় ঘাস আর আগাছা। এ ছাড়া পাঁচিলের ধার ঘেঁষে কয়েকটা বট, অশ্বত্থ, কদম, কৃষ্ণচূড়া, দেবদারু গাছ। আর প্রকাণ্ড জামগাছটা আছে বানজারাদের ঘরের কাছাকাছি। গরমকালে পাকা জাম পড়ে-পড়ে গাছের নীচটা বেগুনি হয়ে থাকে। গাছটার নীচে বসার জন্য কয়েকটা সিমেন্টের বেদি আছে।

বৃষ্টি না হলে এই মাঠেই স্কুলের প্রেয়ার হয়। আর বৃষ্টি হলে যার-যার ক্লাসরুমে।

মাঠের বাঁদিকে একটা দোলনা আর স্লিপ—নীচু ক্লাসের ছেলেদের খেলার জন্য। আর তার পিছনেই সাইকেল রাখার জায়গা।

সাইকেল রেখে অচ্যুত স্কুল-বাড়ির দিকে এগোল।

বড় মাপের ছড়ানো দোতলা বাড়ি। তার পলেস্তারা-খসা রং-চটা চেহারার দিকে খুব খুঁটিয়ে নজর করলে বোঝা যায় একসময়ে বাড়িটার রং গোলাপি ছিল।

স্কুল-বাড়ির একতলার দেওয়ালে তেল রঙে বড়-বড় করে আঁকা মনীষীদের রঙিন ছবি। বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, বিবেকানন্দ, রামমোহন, সবাই সেখানে হাজির। বৃষ্টির জলে ধোয়া ছবিগুলো ঝকঝক করছে।

ওঁদের ছবির দিকে তাকিয়ে সত্যবানস্যারের ব্যাপারটা অচ্যুত কিছুতেই

সত্যি বলে মেনে নিতে পারছিল না।

গায়ে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তেই আকাশের দিকে তাকাল অচ্যুত। আবার শুরু হল! এবার পুজোয় বৃষ্টির পিছু ছাড়াতে পারলে হয়! ও একতলার বারান্দায় ওঠার সিঁড়ির ধাপের দিকে এগোল।

বানজারার ঘণ্টার পর ক্লাস শুরু হল বটে তবে অচ্যুত ভীষণ আনমনা হয়ে রইল। গতকালের ঘটনাটা ওর বুকের ভেতরে ঘুরপাক খেয়ে মাথা খুঁড়ে মরছিল।

প্রথম পিরিয়ডের ঘণ্টা পড়তেই ও চমকে উঠল। কারণ, সেকেন্ড পিরিয়ডটা অঙ্কের—সত্যবানস্যারের ক্লাস।

অচ্যুত কুলদীপের দিকে তাকাল। কুলদীপ দুটো সারি পিছনে বসে। ওর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই কুলদীপ ইশারা করল। যার অর্থ, এক্ষুনি স্যাটাস্যাট আসছেন।

এখনও পর্যন্ত অচ্যুত শুধু কুলদীপকেই ঘটনাটা বলেছে। আর কাউকে নয়। এমনকী বাপি-মা-কেও নয়।

সত্যবানস্যার ক্লাসে এসে ঢুকলেন।

টকটকে ফরসা রং। পিছনদিকে টেনে আঁচড়ানো তেলচকচকে চুল। চোখে সরু কালো ফ্রেমের চশমা। গাল সামান্য ভাঙা—চোয়ালের হাড় উঁচু হয়ে রয়েছে। লম্বাটে নাকের নীচে সরু গোঁফ। গালে দাড়ির নীলচে আভা।

সত্যবানস্যারের পরনে সাদা হাফশার্ট আর গাঢ় বাদামি প্যান্ট। চেহারা বেশ রোগা হওয়ায় প্যান্টটা ঢলঢল করছে। গতকাল স্যার এই পোশাকই পরেছিলেন।

অচ্যুত খুব খুঁটিয়ে স্যারকে দেখছিল। অঙ্ক করতে-করতে মাঝে-মাঝেই কেমন আনমনা হয়ে যাচ্ছেন আর জিভ বের করে ঠোঁটজোড়া চেটে নিচ্ছেন। তেষ্টা পেলে মানুষ যেমন করে।

কিন্তু এরপরই এক অবাক কাণ্ড হল।

বীজগণিতের অনুপাত আর সমানুপাতের কুড়ি প্রশ্নমালার অঙ্কগুলো বোর্ডে স্যার বোঝাচ্ছিলেন। সেই অঙ্ক হঠাৎই আটকে গেল!

অচ্যুত যতদূর জানে সত্যবানস্যারের অঙ্ক কখনও আটকায়নি। কিন্তু আজ এ কী কাণ্ড!

সত্যবানস্যার বোর্ডের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে মাথা চুলকোতে লাগলেন। আঙুলে ধরা চকটা শূন্যে ঘুরিয়ে মনে-মনে যেন অঙ্কটা কষে ফেলতে চাইলেন।

অচ্যুতের মনে পড়ে গেল গতকালের কথা। টিচার্স রুম থেকে বেরিয়ে সত্যবানস্যার একজন অচেনা মানুষের মতো ওদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর স্কুল ছুটির পর টিচার্স রুমের দেওয়ালে ওই কাণ্ড! আর এখন, বরাবর যিনি স্যাটাস্যাট অঙ্ক করেন, তাঁর অঙ্ক গেছে আটকে!

স্যারের কি তা হলে কিছু হয়েছে?

সত্যবানস্যার অনেকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পর চেয়ারে বসে পড়লেন। অঙ্ক কষা নিয়ে এলোমেলো ধানাইপানাই করে চললেন। তারপর, ক্লাস শেষ করে চলে যাওয়ার সময়, কুলদীপকে বললেন, 'কুলদীপ, তোরা কাল সন্ধেবেলা তো কোচিং-এ আসছিস, তখন ভালো করে এটা বুঝিয়ে দেব।'

অচ্যুত, কুলদীপ, প্রতীক, রাজীব আর সৌরভ সত্যবানস্যারের কোচিং-এ একই ব্যাচে পড়ে। স্যারের বাড়ি নৈহাটি। তবে প্রতিদিন স্কুলের পর কোচিং সেরে রাতের ট্রেন ধরেন। তবে কখনও-কখনও রাত হয়ে গেলে কোচিং-এর ঘরটাতেই থেকে যান।

পরের দুটো পিরিয়ড অচ্যুতের আর কাটতে চাইছিল না। ও ভাবছিল, কতক্ষণে টিফিন হবে আর ও কুলদীপকে নিয়ে আলোচনায় বসবে।

গতকাল বাড়ি ফিরে পড়াশোনায় মন বসাতে পারেনি অচ্যুত। সত্যবানস্যারের দেওয়ালে হাঁটার দৃশ্যটা বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। একটা লতানে গাছ যেন সাপের মতো এঁকেবেঁকে সড়সড় করে বেড়ে চলেছে।

লেখাপড়ার চেষ্টা ছেড়ে টিভিতে ই. এস. পি. এন. আর স্টার স্পোর্টস চ্যানেল দেখতে বসে গিয়েছিল, কিন্তু স্যার টিভির পরদাতেও হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন।

মা রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে চোখ সরু করে ওকে দেখছিল। অনেকক্ষণ দেখার পর কাছে এসে জিগ্যেস করল, 'তোর কী হয়েছে রে?'

'কিচ্ছু না।' অচ্যুত মায়ের চোখের দিকে তাকাতে পারল না। শূন্য দৃষ্টিতে টিভির পরদার দিকে চেয়ে রইল।

'তখন থেকে দেখছি কেমন উসখুস করছিস?'

কোনও জবাব দিল না অচ্যুত।

'স্কুলে ঝগড়া-মারপিট করেছিস?'

'না।' মাথা নাড়ল অচ্যুত। টিভির দিক থেকে চোখ সরাল না।

মা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ছেলের মনের ভেতরটা বুঝতে চেষ্টা করল। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সরে গেল রান্নাঘরের দিকে। ভাবল অচ্যুতের বাবা এলে ব্যাপারটা নিয়ে একটু কথা বলবে। ছেলে বড় হচ্ছে। স্কুলে কী সমস্যা বাধিয়ে এসেছে কে জানে।

অচ্যুতের বাবা এখন বাড়িতে নেই। অফিস থেকে ফিরে বটতলার মিষ্টির দোকানের কাছে তাসের আড্ডায় মেতে আছে। ফিরতে-ফিরতে রাত দশটা।

অচ্যুত যখন টিভি, রেডিয়ো, ওয়াকম্যান, বারান্দা, এ-ঘর, ও-ঘর করে ক্লান্ত হয়ে নিজের ঘরে গিয়ে পড়ার টেবিলে বসেছে, ঠিক তখনই কুলদীপের ফোন এল।

অচ্যুত ফোন করেনি দেখে কুলদীপই ওকে ফোন করেছে।

নীচুগলায় ওর সঙ্গে কথা বলল অচ্যুত।

বলল, অমিয়স্যারের দেখা পায়নি। আর সত্যবানস্যারকে ওইরকম করতে দেখেছে।

কুলদীপ ও-প্রান্তে শিস দিয়ে উঠল, বলল, 'কীসব যা-তা বলছিস।'

অচ্যুত বলল, 'মা-কালীর দিব্যি—।'

কুলদীপ আবার চাপা শিস দিল। উত্তেজিত হয়ে উঠলে ও শিস দেয়। আর মেজাজ ভালো থাকলে শিস দিয়ে গান শোনায়।

অচ্যুত এলোমেলোভাবে ওকে সব খুলে বলল। জট পাকানো হলেও গোটা গল্পটা বুঝতে কুলদীপের অসুবিধে হল না। সব শোনার পর ও বিড়বিড় করে শুধু বলল, 'স্যাটাস্যাট আগের জন্মে বোধহয় টিকটিকি ছিল...।'

কুলদীপের রসিকতায় অচ্যুতের হাসি পেল না। ওর মনে পড়ল, টিচার্স রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে ওর হাত-পা ঠকঠক করে কেঁপেছিল।

টিফিনের ঘণ্টা পড়তেই অচ্যুতের চমক ভাঙল।

ক্লাসের অন্যান্য ছেলে বই-খাতা ডেস্কে ঢুকিয়ে হুড়মুড় করে ক্লাসরুম থেকে বেরিয়ে পড়ল। করিডরে ওদের ছুটোপাটি ছুটোছুটিতে হুল্লোড় বেধে

গেল। কার টিফিন বক্স ছিটকে পড়ল মেঝেতে। ঠং করে আওয়াজ হল। লুচি আর আলুভাজা ছড়িয়ে পড়ল। বুট পরা ছুটন্ত পা-গুলো নিমেষে সেগুলো মাড়িয়ে চলে গেল। কারও সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। কতক্ষণে নীচের মাঠে গিয়ে পৌঁছবে সেই চিন্তায় সব মশগুল।

কুলদীপ আর অচ্যুত বেরোল সকলের শেষে। ওদের হাতে টিফিন বক্স।

সিঁড়ি দিয়ে নামার মুখে রাজীব দাসের সঙ্গে ওদের দেখা হল। মুখ কালো করে এক পা এক পা করে নামছে।

গতকাল অমিয়স্যারের সঙ্গে দেখা না হওয়ায় হেডস্যারকে ম্যানেজ করার ব্যাপারটা ভেস্তে গেছে। অচ্যুত রাজীবকে সেটা বলতেই ও কাচুমাচু মুখ করে বলল, 'আমি স্কুলে এসেই হেডস্যারের সঙ্গে দেখা করেছি। বলেছি, আজ মাম্মি আর বাপি কলকাতায় গেছে, কাল এসে দেখা করবে। বিপদে পড়ে মিছে কথা বলতে হল। তোরা আমাকে সেভ কর। তোরা আজ অমিয়স্যারকে একটু বল—প্লিজ! আচ্ছা, মানুষের কি ভুল হয় না?'

রাজীবের চোখে জল এসে গেল।

কুলদীপ বলল, 'অ্যাই, বাংলা সিনেমার লাস্ট সিনের মতো কাঁদবি না। আজ তোর ব্যাপারটা ফয়সালা করে দেব। এখন টিফিন খেয়ে বল খেল গিয়ে।'

অচ্যুত আর কুলদীপ জামগাছতলার সিমেন্ট বাঁধানো বেদির ওপরে গিয়ে বসল। প্রতীক ওদের কাছে বসতে এসেছিল, কিন্তু কুলদীপ ওকে বলল, 'কিছু মনে করিস না—অচ্যুতের সঙ্গে আমার একটু প্রাইভেট টক আছে।'

প্রতীক সন্দেহের চোখে কুলদীপকে দেখল। আজকাল ওকে মাঝে-মাঝেই 'কমলাবালা গার্লস হাইস্কুল'-এর গেটের কাছে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যাচ্ছে। সে-ব্যাপারে প্রাইভেট কথা কি না কে জানে!

কিছু না বলে প্রতীক ভুরু উঁচিয়ে ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

মিহি বরফের গুঁড়োর মতো বৃষ্টি পড়ছে। বাদলা হাওয়ায় সেই গুঁড়ো মুখে উড়ে এসে আরাম ছড়িয়ে দিচ্ছে। মেঘের চাপা গুড়গুড় শোনা যাচ্ছে কখনও-কখনও। একটু দূরে, স্কুলের বাউন্ডারি ওয়াল ঘেঁষে, বানজারার গোরু রামুয়া আর তার বাছুর আপনমনে ঘাস খাচ্ছে।

দুজনের টিফিন মিলিয়ে-মিশিয়ে খেতে-খেতে কুলদীপ বলল, 'স্ট্রেটকাট বল তো, স্যাটাস্যাটের এগেইন্‌স্টে কী অ্যাকশন নিতে চাস?'

অচ্যুত কুলদীপের চোখে তাকাল : 'অ্যাকশন নেব কী, ব্যাপারটা ঠিক কী, সেটাই তো বুঝে উঠতে পারছি না।'

'স্যাটাস্যাটকে একটু ওয়াচ রাখতে হবে।'

'যদি আমাকে ধরে কিছু বলে?' অচ্যুতের বুকের ভেতরে কেমন যেন শব্দ হচ্ছিল।

'ধুস, কী আর বলবে! বলবে যে, আমি দেওয়াল বেয়ে টিকটিকির মতো হাঁটছিলাম! তুমি কিছু মাইন্ড কোরো না।...তা ছাড়া তোকে তো আর একা পাচ্ছে না যে বলবে!'

অচ্যুতের মুখ দেখে মনে হল না খুব ও একটা ভরসা পেয়েছে। ও চুপচাপ বসে বর্ষাভেজা প্রকৃতি দেখতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর কুলদীপ তাড়া লাগাল, 'চল, অমিয়স্যারের সঙ্গে দেখা করে তারপর ক্লাসে যাব। রাজীবের ব্যাপারটা আগে বলা দরকার। নইলে ওর প্রবলেম হয়ে যাবে।'

বেদি ছেড়ে ওঠার সময় অচ্যুত বলল, 'সত্যবানস্যারের কেসটা কিন্তু কাউক্কে বলিস না।'

কুলদীপ মাথা নেড়ে সায় দিল।

মনিটর বাসব আর প্রতীককে সঙ্গে নিয়ে অচ্যুত আর কুলদীপ টিচার্স রুমে গেল। অমিয়স্যারকে অনেক করে বলে-কয়ে ওরা রাজীবের গার্জেন-কল ঠেকাল। অমিয়স্যার অচ্যুতকে বললেন, 'অ্যাই, তোর বাংলা খাতাটা আমার দেখা হয়ে গেছে। এত বানান ভুল করিস কেন রে? অভিধান অবলোকন করবি। ছুটির পর এসে খাতাটা নিয়ে যাস। কাল বর্ষণের জন্যে আমি একটু আথিবিথি বেরিয়ে গিয়েছিলাম।'

আবার সেই 'ছুটির পর'! তার ওপর আবার 'আথিবিথি'! অমিয়স্যারের সঙ্গে পরিচয় না হলে অচ্যুত কোনওদিন জানতেই পারত না ওর মাতৃভাষায় এত মারপ্যাঁচ আছে।

অচ্যুতের চোখ অনেকক্ষণ ধরেই চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছিল। স্যারদের বসার বিশাল টেবিলের শেষ প্রান্তে সত্যবানস্যার বসে আছেন। কী একটা বইয়ের পাতায় ডুবে আছেন। চারপাশের জগৎ সম্পর্কে কোনও হুঁশ নেই।

অচ্যুত অমিয়স্যারের কথার ওপরে কথা বলতে পারল না। শুকনো মুখে ঘাড় নাড়ল। ছুটির পরই ও স্যারের সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

টিফিন শেষের ঘণ্টা একটু আগেই বেজেছে। ওরা চারজন তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে ক্লাসে ফিরে চলল।

অচ্যুতের মনে অশান্তির ঝড় দ্বিগুণ হয়ে গেল। ও কি স্যারের সঙ্গে দেখা করতে একা যাবে, নাকি কুলদীপ, বাসব, কিংবা সৌরভকে সঙ্গে নিয়ে যাবে? কিন্তু সঙ্গে কাউকে নিয়ে গেলে অমিয়স্যার বিরক্ত হতে পারেন। তা ছাড়া টিচার্স রুমে সত্যবানস্যার তো ওকে আর একা পাচ্ছেন না!

সুতরাং ছুটির ঘণ্টা পড়তে-না-পড়তেই অচ্যুত পা চালাল টিচার্স রুমের দিকে। দেরি করে গেলে টিচার্স রুম ফাঁকা হয়ে যেতে পারে। সেই ঝুঁকি অচ্যুত নিতে চায় না।

টিচার্স রুমে গিয়ে দেখল অমিয়স্যার ছাড়া আরও অনেক স্যারই তখন সেখানে রয়েছেন। যদিও সত্যবানস্যারকে অচ্যুত দেখতে পেল না।

অনুমতি নিয়ে অমিয়স্যারের কাছে গেল অচ্যুত। স্যারের কাছ থেকে খাতা নিয়ে ব্যাগে ঢুকিয়ে করিডর ধরে হাঁটা দিল।

সিঁড়ি নামার সময় ওর কাঁধে কে যেন হাত রাখল।

মুখ তুলে তাকাল অচ্যুত।

সত্যবানস্যার। মুখে এক চিলতে হাসি। জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট চাটছেন।

আশেপাশে আরও কয়েকজন ছেলে সিঁড়ি বেয়ে নামছে। কিন্তু ওরা নিজেদের মধ্যে গল্প করতেই মশগুল।

সত্যবানস্যার ওর সঙ্গে-সঙ্গে নামতে লাগলেন, আর চাপা গলায় কথা বলতে লাগলেন।

'জানিস তো, মানুষ অনেক সময় ভুল দ্যাখে! যেমন, তুই কাল বিকেলে যা দেখেছিস ভুল দেখেছিস। কারণ, তুই যা দেখেছিস সেটা প্রমাণ করতে পারবি না। আর প্রমাণ দিতে না পারলে কেউ তোর কথা বিশ্বাসও করবে না।' স্যার হিসহিস শব্দ করে হাসলেন : 'এখন বিজ্ঞানের যুগ। সবাই শুধু প্রমাণ চায়।'

গলা শুকিয়ে কাঠ। কাঁধের ওপরে স্যারের আঙুলের চাপে ব্যথা লাগছে। মাথাটা কেমন ঝিমঝিম করছে। অচ্যুতের মনে হচ্ছিল এখুনি বুঝি ও অজ্ঞান হয়ে যাবে।

একতলায় নেমে সত্যবানস্যার বাঁদিকে কয়েক পা হেঁটে গেলেন। ক্লাস ফাইভের বি সেকশানের ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন।

অচ্যুত কাঠের পুতুলের মতো স্যারের পাশে-পাশে হাঁটছিল। স্যার থমকে দাঁড়াতেই ও-ও দাঁড়িয়ে পড়ল।

এদিকের বারান্দাটা এর মধ্যেই ফাঁকা হয়ে গেছে। সুতরাং, ওদের কথা শুনতে পাবে কাছাকাছি এমন কেউ নেই।

ক্লাসরুমের দরজার কাছটায় অচ্যুতকে একরকম ঠেলেই নিয়ে গেলেন সত্যবানস্যার। চাপা গলায় বললেন, 'শোন, কাউকে কোনও কথা বলবি না। অবশ্য বললেও কেউ আমল দেবে না। ওরে, মানুষের কি ভুল দেখার কোনও শেষ আছে! এই দ্যাখ—!' বলেই স্যার অচ্যুতের চোখে তাকালেন।

অচ্যুত দেখল, সেখানে ধকধক করছে দুটো সবুজ টুনি বাল্‌ব। আর তার মধ্যে দুটো কালো ফুটকি হল চোখের মণি।

'এটাও তুই ভুল দেখছিস।' মিহি সুরেলা গলায় সত্যবানস্যার বললেন, 'কারণ, তুই এটা প্রমাণ করতে পারবি না। সুতরাং তোর কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সত্যবানস্যার। তার হিমেল ঝাপটা অচ্যুতের মুখ ছুঁয়ে গেল। অচ্যুতের গায়ে কাঁটা দিল।

ও লক্ষ করল, স্যারের চোখের সবুজ রং ধীরে-ধীরে ফিকে হয়ে সাদাটে হয়ে গেল। তারপর সামান্য ছাই-রং হয়ে কটা চোখের চেহারা নিল। তারপর কালচে হয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

সত্যবানস্যার হাসলেন, 'তুই কাউকে কিচ্ছু বলবি না! কারণ, তুই আসলে কিছুই দেখিসনি। কাল সন্ধেবেলা কোচিং-এ আসবি, কামাই করবি না। ভাবিস না, তুই পালিয়ে বাঁচবি। আমাদের হাত থেকে পালানো যায় না—।'

অচ্যুত ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিল। ওর মুখ থেকে কোনও শব্দ বেরোল না। কাঁধের ওপর স্যারের বাঁকানো আঙুলের চাপ যেন ছুরি বিঁধিয়ে দিচ্ছিল।

'এখন যা।' সত্যবানস্যার ওর কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ওকে আলতো করে ঠেলে দিলেন ঃ 'তুই কিন্তু কিছুই দেখিসনি—।'

অচ্যুত আর-একটু হলে টলে পড়ে যাচ্ছিল। কোনওরকমে নিজেকে সামলে নিয়ে ও মাঠে নামার সিঁড়ির ধাপের দিকে এগোল। ভয়ে পিছন ফিরে তাকাতে পারল না।

জল-কাদা পেরিয়ে যখন ও সাইকেল-স্ট্যান্ডের কাছে পৌঁছল তখন

প্রতীক ওকে পিছন থেকে ডাকল।

অচ্যুত ফিরে তাকাতেই প্রতীক জিগ্যেস করল, 'তোকে স্যাটাস্যাট ওরকম হাসতে-হাসতে কী বলছিল রে?'

'কিছু না। কাল কোচিং-এর খাতা-বই ঠিকমতো নিয়ে যাওয়ার কথা বলছিল।' অচ্যুতের গলা সামান্য কেঁপে গেল।

'তোকে স্যার হেভি ফেভার করে।' বেজার মুখে বলল প্রতীক, 'অবশ্য ফেভার তো করবেই। তুই অঙ্কে একশোয় একশো পাস, আর আমার নম্বরটা চার কি পাঁচ দিয়ে গুণ করলে তবে একশো হয়। তবে অঙ্ককে আমি মোটেই ভয় পাই না। পারি-না-পারি, লড়ে যাই।'

অচ্যুত হাসতে পারল না।

কারণ, সত্যবানস্যারের একটা কথা বারবার ওর মনে কাঁটার মতো বিঁধছিল।

বাড়ি ফিরেও ওর খচখচানিটা গেল না।

স্যার বলেছেন, '...আমাদের হাত থেকে পালানো যায় না—।'

এর মানে কী?

॥ চার ॥

অচ্যুত রাতে কুলদীপ আর সৌরভকে ফোন করল। পড়াশোনা নিয়ে কথা বলল, কোচিং নিয়ে কথা বলল, কিন্তু সত্যবানস্যারের কথা বলল না। বরং কুলদীপ উৎসাহ নিয়ে সত্যবানস্যারের রহস্য ভেদ করার ব্যাপারে নানান উদ্ভট পরামর্শ দিল। বলল, 'স্যারকে ফলো করতে হবে, বুঝলি! সবসময় নজরে-নজরে রাখতে হবে। তা হলেই কেসটা বোঝা যাবে।'

অচ্যুত তখন ভাবছিল, কুলদীপ তো আর স্যারের সবুজ চোখ দ্যাখেনি! দেখলে বোঝা যেত ওর এখনকার এত সাহস কতটা চুপসে যায়।

রাতে বিছানায় শুয়ে অচ্যুত একরকম জেগেই রইল। ওর ভেতর থেকে ভয়টা কিছুতেই যেতে চাইছিল না। পরদিন স্কুলে যাওয়া নিয়ে সামান্য ভয় করলেও ও সেটা মা-বাপিকে বুঝতে দিল না। মনে-মনে ঠিক করল, স্কুলে কখনও ও আর একা থাকবে না। যেখানেই যাক, দু-একজন বন্ধুকে সঙ্গে নেবে। এমনকী টয়লেটে গেলেও।

স্কুলের সময়টা শান্তিমতোই কেটে গেল। তবে একবার সত্যবানস্যার করিডরে অচ্যুতের পাশ দিয়ে হেঁটে গেছেন—কিন্তু ওকে চিনতে পারেননি।

অচ্যুতের সঙ্গে প্রতীক ছিল। পরশুদিন সত্যবানস্যারের এরকম অদ্ভুত আচরণ ও নিজের চোখে দেখেছে। স্যার চলে যাওয়ার পর ও চাপা গলায় বলল, 'যা-ই বল, স্যাটাস্যাট কিন্তু একেবারে চেঞ্জ হয়ে গেছে!'

অচ্যুত চুপ করে রইল। এই দেড় দিনে চুপ করে থাকাটা ওর দিব্যি অভ্যেস হয়ে গেছে।

স্কুল ছুটির পর একটা বিচিত্র দৃশ্য অচ্যুতের চোখে পড়ল। ওরা যখন বেরোচ্ছে তখন দেখল সত্যবানস্যার মাঠের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বানজারার গোরু আর বাছুরকে আদর করছেন। ওদের গলার কাছে কুচি দেওয়া যে

নরম চামড়া থাকে—যাকে গলকম্বল বলে—সেখানে হাত বোলাচ্ছেন। আর অবোলা জীব দুটো চুপটি করে দাঁড়িয়ে স্যারের আদর খাচ্ছে।

গোরু-বাছুরকে আদর করাটা নিশ্চয়ই খারাপ নয়। কিন্তু সত্যবানস্যারকে আগে কখনও কেউ এরকম আদর করতে দ্যাখেনি।

সাইকেল চালিয়ে বাড়ির ফেরার পথে নানান দুশ্চিন্তা অচ্যুতের মাথার ভেতরে ছোটাছুটি শুরু করে দিল।

ঘণ্টাদুয়েক পর যখন ও সত্যবানস্যারের কোচিং-এ রওনা হল তখনও চিন্তাগুলো ওর মাথা থেকে যায়নি।

আকাশ ঘোলাটে মেঘলা। ভেজা মেঘের আড়ালে আবছাভাবে চাঁদ দেখা যাচ্ছে। বেহিসেবি বাদলা হাওয়া কখনও-কখনও গাছগাছালির পাতা দুলিয়ে দিচ্ছে। ভাঙাচোরা রাস্তায় এখানে-ওখানে জল-কাদার নকশা। দোকানপাটে খদ্দেরের তেমন ভিড় নেই।

পথ চলতি সাইকেল রিকশা আর স্কুটারকে পাশ কাটিয়ে সাবধানে সাইকেল চালাচ্ছিল অচ্যুত। সত্যবানসারের কোচিং-এ স্কুলের পাশ দিয়েই যেতে হয়। যাওয়ার সময় দেখল, অন্ধকারে ভূতের মতো দোতলা স্কুল-বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। শুধু বানজারার ঘরে আলো জ্বলছে।

কোচিং-এ পৌঁছে প্রথম-প্রথম একটা 'কী হয়, কী হয়' ভাব থাকলেও শেষ পর্যন্ত কোচিং-এর সময়টা বেশ স্বাভাবিকভাবেই কাটল। গত সপ্তাহের মতো তুখোড় পেশাদার ঢঙেই পড়ালেন সত্যবানস্যার। অচ্যুতের অঙ্ক কষার কেরামতিকে তারিফ করলেন, ওর পিঠ চাপড়ে দিলেন। প্রতিটা অঙ্ক বেশ সহজ করে সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন। মনোযোগ দিয়ে খাতা দেখে দিলেন। সব মিলিয়ে কোথাও কোনও ছন্দপতন নেই।

তবে একটা ব্যাপারে সামান্য খটকা লাগল অচ্যুতের।

রাজীবের অঙ্কের অবস্থা প্রতীকের মতোই। তার ওপর রাজীবের আবার অঙ্ক নিয়ে আতঙ্ক আছে। অঙ্ক কষতে গিয়ে ও ঘন-ঘন আটকে যাচ্ছিল। সত্যবানস্যার অনেকক্ষণ ধরে ওকে লক্ষ করছিলেন। তারপর ওর কাছে গিয়ে আলতো করে ঘাড়ে হাত বোলাতে লাগলেন : 'চেষ্টা কর, ঠিক পারবি। পৃথিবীতে কোনও কিছুই অসম্ভব নয়—।'

রাজীবকে আজ যেন স্যার বড্ড বেশি যত্ন নিয়ে অঙ্ক দেখাচ্ছেন। আগে কখনও এই যত্ন অচ্যুতের চোখে পড়েনি। তার ওপর ঘাড়ে যেরকম

মোলায়েম করে হাত বোলাচ্ছেন তাতে বানজারার গোরু-বাছুরকে আদর করার কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল।

অচ্যুত মনে-মনে নিজেকে ধমক দিল। আজকাল ওর কী হয়েছে! সবকিছুতেই শুধু খটকা লাগছে! একজন স্যার কি হঠাৎই স্নেহপ্রবণ হতে পারেন না?

কিন্তু ধমক খেয়েও অচ্যুতের মন মানতে পারছিল না। বরং ভাবছিল, হঠাৎ করে কেউ যদি দেওয়াল বেয়ে হাঁটতে শুরু করে তা হলে তার আচমকা স্নেহপ্রবণ হয়ে উঠতে বাধা কী!

কোচিং শেষ করে ফেরার সময় রাজীব বলল, 'অচ্যুত, আমি তোর সঙ্গে যাব। আমাকে পরেশদার কেকের দোকানে নামিয়ে দিবি।'

রাজীবের সাইকেল নেই। অ্যাক্সিডেন্ট হবে এই ভয়ে বাবা-মা কিনে দেননি।

কুলদীপ কোচিং ক্লাস চলার সময় অনেকবার অচ্যুতের দিকে তাকিয়ে হতাশভাবে ইশারা করেছে। ঠোঁট উলটে মাথা নেড়েছে। অর্থাৎ, সন্দেহজনক কিছু নজরে পড়ছে না।

অচ্যুত কোনও উত্তর দেয়নি।

কোচিং-এর বাইরে বেরিয়ে অচ্যুতের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে কুলদীপ বলল, 'ধৈর্য চাই, ধৈর্য। সহজে এ-রহস্যের জট খুলবে না।'

অচ্যুত 'হুঁ—' বলে সায় দিল।

ওর সাইকেলে সামনের রডে বসার সময় রাজীব জিগ্যেস করল, 'আমাকে ক্যারি করতে পারবি তো? এই জল-কাদায় যদি ফেলে দিস তা হলে জামা-প্যান্টের বারোটা বেজে যাবে। তারপর মাম্মির হাজারটা কোশ্চেন—।'

'তোর কোনও ভয় নেই। আমি তিনমাস ধরে ডাবল ক্যারি করছি।'

ওকে বসিয়ে নিয়ে অচ্যুত সাবধানে সাইকেল চালাতে লাগল।

এখন বৃষ্টি নেই। তবে কখন শুরু হবে কেউ বলতে পারে না। কাগজে লিখেছে কোথায় যেন নিম্নচাপ হয়েছে—তার জন্যই নাকি এরকম বাজে অবস্থা।

একটু পরেই ওরা স্কুলের কাছাকাছি চলে এল।

স্কুলের একরকম পাশেই এক প্রকাণ্ড পুকুর। তার ঢালু পাড়ে বড়-বড়

মানকচু গাছ আর আগাছার ঝোপ। নাম-না-জানা লতানে গাছের দল আধো-অন্ধকারে সাপের মতো জড়াজড়ি করে রয়েছে।

পুকুরপাড়ের বেড়ে ওঠা আগাছার রমরমাকে রুখে দিয়েছে ছোট-ছোট চার-পাঁচটা দোকান। দরমা, বাঁশ আর চাটাই দিয়ে ঘেরা চা-সিগারেট-পান-বিড়ির দোকান। সেখানে হ্যারিকেন বা কুপির আলো জ্বলছে।

দোকানগুলোর ফাঁক দিয়ে চোখে পড়ছে অন্ধকার আর কচু পাতার কালো ছায়া। সেখান থেকে নানান সুরে ভেসে আসছে ব্যাঙের ডাক।

পুকুর পেরিয়ে স্কুলের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় গোরুর 'হাম্বা' ডাক অচ্যুতের কানে এল।

অচ্যুত বলল, 'স্যাটাস্যাট আজ তোকে ব্যাপক আদর করছিল।'

'হ্যাঁ রে, আমিও তো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছি। অন্যদিন কীরকম বকুনি দেয়! বলে, বাপিকে রিপোর্ট করবে...।'

'এবার তুই অ্যানুয়ালে অঙ্কে এইট্টি পারসেন্ট পাবি।'

'ভ্যাট!'

'দেখিস...।'

পরেশদার কেকের দোকান এসে গিয়েছিল। অচ্যুত দোকানের কাছ ঘেঁষে সাইকেল থামাল। কাঁচা ড্রেনের ওপরে পাতা সিমেন্টের স্ল্যাবে ওর সামনের চাকা ঠেকে গিয়ে সামান্য ঝাঁকুনি লাগল।

রাজীব সাইকেল থেকে নেমে দাঁড়াল ঃ 'কাল টিফিনের জন্যে কেক আর প্যাটিস কিনব।'

অচ্যুত টিফিনে মায়ের হাতে তৈরি লুচি কিংবা পরোটা নিয়ে যায়—সঙ্গে আলুর তরকারি বা আলুভাজা। মাসে দু-একদিন কেক বা প্যাটিস। আর দু-তিনটাকা পকেটে থাকলে টিফিনের সময় স্কুলের দরজায় ভিড় করে দাঁড়ানো বিভিন্ন 'ওলাদের' কাছ থেকে ঝালমুড়ি, ঘুগনি বা বাদাম খায়।

রাজীব হঠাৎ জিগ্যেস করল, 'একটা সিগারেট টেস্ট করে দেখবি নাকি?'

'না, না—আমার ওসব ভালো লাগে না।'

'সেদিন কুলদীপ দু-চার টান দিয়েছিল। মন্দ নয়। জানিস তো, ও মাঝে-মাঝে স্মোক করে!'

'জানি!'

রাজীব আবদারের গলায় বলল, 'যাই বল, আজ এরকম বৃষ্টি-বাদলার

দিন...একটা সিগারেট ধরাতে ইচ্ছে করছে। অচেনা দোকান থেকে কিনব। তারপর দুটো টফি খেয়ে বাড়ি যাব—কেউ গন্ধ পাবে না। তুই খাবি না—শিয়োর?'

অচ্যুত হেসে বলল, 'না।'

তারপর রাজীবকে টা-টা করে চলে গেল।

রাজীব পরেশদার দোকানে ঢুকতে যাচ্ছে, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন ওকে নাম ধরে ডাকল।

ঘুরে তাকাল রাজীব।

সত্যাবানস্যার। সাইকেল পাশে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। রাজীবের দিকে তাকিয়ে অল্প-অল্প হাসছেন।

রাজীব স্যারের কাছে এগিয়ে গেল, 'কিছু বলবেন, স্যার?'

'হ্যাঁ। কী কিনবি কিনে নে, তারপর চল, যেতে-যেতে বলছি। তোর বাড়ি তো স্টেশনের দিকে। চল, তোকে বাড়ির কাছে নামিয়ে দেব।'

'সিগারেট খাওয়াটা ভোগে গেল, 'মনে-মনে ভাবল রাজীব। স্যার যে পিছন-পিছন আসবেন তা ও কেমন করে জানবে! এরকম আগে কখনও হয়নি।

কিন্তু রাজীব অবাক ভাবটা চেপে রাখল। ছোট্ট করে বলল, 'একমিনিট ওয়েট করুন, স্যার, আমি এক্ষুনি আসছি।'

তারপর ছুট্টে ঢুকে পড়ল পরেশদার দোকানে।

পরদিন স্কুলে ঢুকে অচ্যুত দেখল বানজারার ঘরের সামনে অনেক ছাত্রের ভিড়। দু-একজন গার্জেন আর স্যারও দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে।

সাইকেল জায়গামতো রেখে মাঠের কোণের দিকটায় ছুটে গেল অচ্যুত। ভিড় ঠেলে সরিয়ে ভেতরে ঢুকল।

দৃশ্যটা দেখার আগেই বানজারার বউয়ের কান্না শুনতে পাচ্ছিল অচ্যুত। কাঁদছিল আর দেশোয়ালি ভাষায় বিলাপ করছিল। ওর কথার একটি বর্ণও অচ্যুত বুঝতে পারছিল না। শুধু 'রামুয়া' শব্দটা শুনতে পাচ্ছিল আর এটুকু বুঝতে পারছিল, ভালোবাসার কেউ মারা গেলে মানুষ এরকম বুকফাটা কান্নায় ভেঙে পড়ে।



...ওর সাইকেলে সামনের রডে বসার সময় রাজীব জিগ্যেস করল, 'আমাকে ক্যারি করতে পারবি তো?'

বৃত্তের ভেতরে ঢুকে দৃশ্যটা দেখতে পেল অচ্যুত।

রামুয়া আর ওর বাছুর মাটিতে পাশাপাশি পড়ে আছে। ওদের চোখ বোজা। বানজারার বউ ওদের ওপর শরীর এলিয়ে কাঁদছে।

বানজারা একপাশে বেজার মুখে উবু হয়ে বসে ছিল। চোখ ছলছল। মাথাটা ডানহাতে ভর দিয়ে হেলানো।

অচ্যুত অবাক হয়ে দেখল, রামুয়ার ধপধপে সাদা গলায় রক্তের দাগ। খানিকটা রক্ত শুকিয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে। ওর বাছুরের দশাও তাই। ঠিক মনে হচ্ছে, কোনও হিংস্র জন্তু ওদের নরম গলায় কামড় দিয়েছে।

কিন্তু এই সামান্য ক্ষত থেকে কি এতবড় মাপের একটা গোরু মরে যেতে পারে?

তা ছাড়া কোন জানোয়ারই-বা গোরুর গলায় এভাবে কামড়ায়? সাপ, নাকি কুকুর?

বানজারা এবং আশেপাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনের কথাবার্তার টুকরো জুড়ে গোটা গল্পটা মোটামুটি আঁচ করতে পারল অচ্যুত।

আজ ভোর-রাতের দিকে গোয়ালঘর থেকে একটা ঝটাপটির শব্দ বানজারা শুনতে পায়। ব্যাপারটা কী বোঝার জন্য ও বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। কিন্তু ততক্ষণে সব আবার চুপচাপ হয়ে গেছে। তখন বানজারা আর ঘর ছেড়ে বেরোয়নি। অনেক সময় রামুয়া আচমকা খেপে উঠে পা ছোড়াছুড়ি করে। ব্যাপারটা সেইরকম কিছু একটা ভেবে বানজারা আবার শুয়ে পড়ে। পাশে ঘুমিয়ে থাকা বউকেও আর ডাকেনি।

সকালবেলা ঘর বেরিয়েই বানজারার বউ চিৎকার করে ওঠে। সেই চিৎকার শুনে বানজারা ছুটে যায়। দ্যাখে রামুয়া গোয়ালঘরের বাইরে জলকাদার ওপরে কাত হয়ে পড়ে আছে—তখনও দেহ একেবারে অসাড় হয়ে যায়নি। আর ওর বকনা বাছুরটা গোয়ালঘরের ভেতরে চোখ কপালে তুলে শেষ।

বানজারা আর ওর বউ মিলে বাছুরটার দেহ গোয়ালঘরের গুমোট অন্ধকার থেকে বাইরের খোলা হাওয়ায় নিয়ে আসে। তারপর ঘটির পর ঘটি জল ঢেলে মা-মেয়েকে বাঁচানোর অনেক চেষ্টা করে, কিন্তু সবই বেকার। দুজনেরই দেহান্ত হয়ে যায়।

অচ্যুতের দৃশ্যটা ভালো লাগছিল না। ও ভিড় ঠেলে বাইরে বেরিয়ে এল।

পিছন থেকে কুলদীপ ওর কাঁধে হাত দিল।

অচ্যুত চমকে উঠল। কুলদীপ কখন এসেছে ও টের পায়নি।

কুলদীপ হাতঘড়ি দেখে বলল, 'চল, ক্লাস বসে যাবে। আজ তো আর ঘণ্টা পড়বে না।'

'ওই গোরু আর বাছুরটার কী করে এমন দশা হল বল তো!'

'কী জানি!' ঠোঁট ওলটাল কুলদীপ : 'শোন, আজ সকালে মউলি ফোন করেছিল। ও আজ হিস্ট্রি কোচিং-এ যাবে না। তোর নোটটা নেক্সট উইকে ফেরত দেবে।'

অচ্যুতরা কয়েকজন সুপারমার্কেটের কাছে ইতিহাস পড়তে যায়। ওখানে নগেনস্যারের কোচিং আছে। নগেনস্যার চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের টিচার ছিলেন—প্রায় বছরদশেক হল রিটায়ার করেছেন। নগেনস্যার যখন ইতিহাস পড়ান তখন অচ্যুতদের মনে হয় ওরা যেন সিনেমা দেখছে। ওদের চোখের সামনে চন্দ্রগুপ্ত, চাণক্য, মেগাস্থিনিস চলে-ফিরে বেড়াচ্ছে।

মউলি কমলাবালা গার্লস হাইস্কুলে পড়ে। অচ্যুতদের পাশের বাড়িতেই থাকে, অথচ সবসময় কুলদীপকে ফোন করে অচ্যুতকে খবর দেয়।

মউলি খুব ছটফটে, শাড়ি পড়তে ভালোবাসে না, বেণী দুলিয়ে হাঁটে। একদিন বিকেলে ছাদে উঠে ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল অচ্যুত। খেয়াল করেনি যে, ওদের ছাদে দাঁড়িয়ে মউলি ওর ঘুড়ি ওড়ানোর হাস্যকর চেষ্টা দেখছে।

'যারা সবসময় লেখাপড়া করে তারা ঘুড়ি ওড়াতে গেলে এরকমই হয়—।'

ঘুড়ি ওড়ানো থামিয়ে ফিরে তাকাল অচ্যুত। ওর ময়ূরপঙ্খী ঘুড়িটা গোঁত খেয়ে সামনের বাড়ির শিউলি গাছে আটকে গেল।

তাই দেখে মউলি খিলখিল করে হেসে গড়িয়ে পড়েছিল।

অচ্যুত বলল, 'আমি মোটেই সবসময় লেখাপড়া করি না—তা হলে এখন ঘুড়ি ওড়াচ্ছি কী করে।'

ঠোঁট বেঁকাল মউলি : 'আজকের ব্যাপারটা তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট। তুমি দিনরাত লেখাপড়া করো বলেই তো আমার পড়ায় মন বসে না—।'

ধুত, যত্তসব উলটোপালটা কথা। ওর অভিযোগ হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল অচ্যুত। বলল, 'এরকম আবার হয় নাকি!'

'হয়। দেখবে, আজ আমার কী দারুণ পড়ায় মন বসবে। মাঝে-মাঝে এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হলে বেশ হয়...তা হলে সব কাজে আমার মন বসবে।'

অচ্যুত কিছু বুঝে উঠতে পারছিল না। ও ছাদের পাঁচিলের কাছে এসে সাত-আট ফুট দূরে দাঁড়িয়ে থাকা মউলিকে দেখছিল। মউলির মাথার পিছনে সূর্য অস্ত যাবে বলে তৈরি হচ্ছিল।

মাঝে-মাঝে এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হলে বেশ হয়...। তার মানে?

মউলি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, 'সকালে আর বিকেলে ছাদে এসে একটু ফ্রেশ বাতাস তো নিতে পারো। তা হলে দেখবে, ভালো হবে।'

'কার?'

'দুজনেরই।'

মউলির মুখে সূর্যের তেরছা আলো পিছলে গেল। ও চটপট ঘুরে দাঁড়িয়ে একরকম ছুটেই চলে গেল।

সেদিন অচ্যুত ছাদে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছিল। ঘুড়ি-লাটাই হাতে নিয়ে মউলির এলোমেলো কথার মানে বোঝার চেষ্টা করেছিল।

তারপর থেকে অচ্যুত লক্ষ করেছে, মউলির কাজের কিছু বলার থাকলে ও কুলদীপের মারফত বলে পাঠায়। ইতিহাস কোচিং-এ যখন পড়তে যায় তখনও ও অচ্যুতের সঙ্গে খুব একটা কথা বলে না। বরং ছাদে যখন দেখা হয় তখন অনেক সহজভাবে অনেক উলটোপালটা অকাজের কথা বলে। বলে, 'তুমি ভিতু, তোমার মাথায় বুদ্ধি নেই। কী করে অঙ্কে একশোয় একশো পাও কে জানে!'

অচ্যুত জবাব না দিলেও ওর কথাগুলো নিয়ে চুপচাপ বসে ভাবে।

এখন কুলদীপ যে-নোটটার কথা বলেছে সেটা মউলি চেয়ে পাঠিয়েছিল কুলদীপের মারফত। আবার সেটা ফেরতও আসবে কুলদীপের হাত দিয়ে। তা হলে তো মউলি কুলদীপের কাছ থেকেই নোটটা নিতে পারত! কারণ, নগেনস্যারের ডিকটেশান থেকে ওরা সবাই নোট নিয়েছিল। সেদিন মউলি আসেনি।

আবার একদিন ছাদে দেখা হতে অচ্যুত এই অদ্ভুত 'যোগাযোগ ব্যবস্থা'

নিয়ে প্রশ্ন করেছিল। উত্তরে মউলি হেসে বলেছিল, 'এতে একটা অন্যরকম মজা আছে—তুমি বুঝবে না।'

ওর ভ্যাবাচ্যাকা মুখের দিকে তাকিয়ে একটু পরে মউলি বলেছে, 'ঠিক আছে, আমি দুটো এক্স্যাম্পল দিয়ে তোমাকে বোঝাচ্ছি। সামনাসামনি কথা বলার চেয়ে টেলিফোনে কথা বললে কত ভালো লাগে! আবার সেই কথাগুলো চিঠি দিয়ে বলাবলি করলে...ওঃ, ফ্যান্টাস্টিক।'

একটু চুপ করে থেকে অচ্যুতকে দেখল মউলি। তারপর জিগ্যেস করল, 'কিছু বুঝলে?'

অচ্যুত মাথা নাড়ল। সত্যিই ও কিছু বোঝেনি।

তাই এখন কুলদীপের কথায় ও শুধু ঘাড় হেলাল।

তখনই ওর চোখ গেল স্কুলের দোতলার বারান্দার দিকে।

সত্যবানস্যার বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে একমনে সিগারেট খাচ্ছেন। নীচে বানজারার ঘরের কাছে যে অত হইচই, ভিড়, সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপও নেই।

হঠাৎই মাঠে একটা শোরগোল ব্যস্ততা শুরু হল। ছাত্রের দল প্রায় ছুটে চলে গেল স্কুল বিল্ডিং-এর কাছে। হুড়মুড় করে যার-যার ক্লাসরুমের দিকে রওনা হল।

ওদের কথাবার্তার টুকরো শুনে অচ্যুতরা বুঝল হেডস্যার এসে গেছেন। পিছন ফিরে তাকাতেই ওরা হেডস্যারকে দেখতে পেল।

হেডস্যার মোহনলাল পুরকায়স্থ রোগা শরীরটাকে টান-টান করে মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে আসছেন। মাথায় টাক, চোখে চশমা, ভাঙা গাল, চোয়াল শক্ত। দেখলেই বোঝা যায় বেশ কড়া ধাতের মানুষ। সবসময় ডিসিপ্লিন বজায় রাখতে চান। কিন্তু আজ প্রেয়ার হবে কি না কে জানে! বানজারা ঘণ্টা বাজাতে পারেনি। তা ছাড়া অনেকটা দেরিও হয়ে গেছে।

কিন্তু প্রেয়ারের ঘণ্টা বাজল—দেরিতে হলেও। হেডস্যার পরিস্থিতির দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছেন। এখন বানজারার গোরু-বাছুরের মৃতদেহের নিশ্চয়ই একটা গতি হবে। কিন্তু কোন প্রাণী ওদের গলার অমন হিংস্র কামড় বসিয়েছে সেটা জানা যাবে কী?

ক্লাস বসল। অচ্যুত ভালো করে পড়ায় মন দিতে পারছিল না। বারবার ভাবছিল, স্কুলে হঠাৎ এসব কী শুরু হল!

টিফিনের সময় প্রতীক ওকে জিগ্যেস করল, 'কী রে, রাজীব আজ এল না?'

অচ্যুত বলল, 'দেখছি তো আসেনি—।' একইসঙ্গে ওর মনে পড়ে গেল, রাজীব আজ টিফিনের জন্য কেক-প্যাটিস কিনতে পরেশদার দোকানে নেমেছিল।

তা হলে কি হঠাৎ করে ওর জ্বর-টর হল!

চুরির ব্যাপারটা ধরা পড়ার পর থেকে রাজীব ওদের অনেক কাছাকাছি চলে এসেছে। নিজের অন্যায়ের জন্য বারবার ওদের কাছে দুঃখ করেছে, ক্ষমা চেয়েছে। অচ্যুত ভাবল, রাতে একবার ফোন করে রাজীবের খবর নেবে। কিন্তু তখনই খেয়াল হল, ওর কাছে তো রাজীবের ফোন নম্বর নেই। তখন ও প্রতীককে বলল ফোন করে রাজীবের খবর নিতে।

টিফিনের সময় প্রতীক পকেট থেকে একটা পাতলা ক্যালকুলেটার বের করে অচ্যুতদের দেখাল : 'আমার ছোটমামা পরশু আমেরিকা থেকে ফিরেছে—আমার জন্যে এটা নিয়ে এসেছে।'

ওরা একে-একে ওটা হাতে নিয়ে বোতাম টিপে দেখতে লাগল।

কুলদীপ বলল, 'এই, তোরা ক্যালকুলেটর পরে দেখবি—আগে শোন। সামনের শনিবার দুটোর সময় 'সি' সেকশনের সঙ্গে আমাদের ফুটবল ম্যাচ ঠিক করেছি। আজ ছুটির পর টিম ফাইনাল করে ফেলতে হবে।'

বাসব আর সৌরভ হইহই করে উঠল। ওরা দুজনে ফুটবলের পোকা।

তারপর ফুটবল নিয়ে জোরালো আলোচনা শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য বিপজ্জনক অশুভ ঘটনাগুলো মুছে গেল ওদের মন থেকে।

সেদিন ছুটির পর অচ্যুত যখন সাইকেল করে বাড়ি ফিরছিল তখন ওর মনটা বেশ হালকা লাগছিল। আজ সাতটার সময় নগেনস্যারের কাছে পড়া আছে। মউলি আজ আসবে না। কুলদীপকে দিয়ে মউলি যেমন খবর পাঠায়, অচ্যুতেরও কি পালটা কোনও খবর পাঠানো উচিত? নাকি কাল বিকেলে ছাদে উঠে ওর জন্য অপেক্ষা করবে? যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয়! মউলিকে সত্যবানস্যারের ব্যাপারটা একটুও বলা হয়নি। বলতে পারলে অচ্যুতের মন হালকা হত।

ইতিহাসের কোচিং সেরে অচ্যুত বাড়ি ফিরল প্রায় পৌনে নটা নাগাদ। আর ফিরেই শুনল প্রতীক ওকে ফোন করেছিল। কোচিং থেকে ফিরলে ফোন করতে বলেছে। খুব জরুরি দরকার।

বই-খাতা গুছিয়ে রেখে প্রতীককে ফোন করল অচ্যুত।

একবার রিং বাজতে-না-বাজতেই প্রতীক রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলল।

'আমি অচ্যুত—।'

'ওঃ, তোর ফোনের জন্যেই ওয়েট করছিলাম। এক্ষুনি রাজীবের বাড়িতে যেতে হবে।'

'কেন?' অচ্যুত অবাক হয়ে গেল।

'সে অনেক ব্যাপার—গেলে সব জানতে পারবি। আমি কুলদীপকে ফোন করে দিচ্ছি, ও দশ মিনিটের মধ্যে রাজীবের বাড়ি পৌঁছে যাবে। তুইও চলে আয়।'

অচ্যুতের বুকের ভেতরে একটা ধকধকানি শুরু হল। রাজীব কাল টিফিনের কেক-প্যাটিস কিনেছিল, কিন্তু আজ স্কুলে আসেনি! ওর কি কোনও বিপদ হয়েছে?

'কী হয়েছে রাজীবের?' অচ্যুতের গলার স্বরটা খসখসে হয়ে গেল।

'বললাম তো, গিয়ে সব শুনবি—।'

ফোন রেখে দিল প্রতীক।

অচ্যুত মায়ের কাছে গিয়ে বলল, 'আমাকে এখুনি একবার সাইকেল নিয়ে বেরোতে হবে।'

'কেন রে, রাত নটার সময় কোথায় বেরোবি?'

অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে মিথ্যে কথা বলল অচ্যুত, 'প্রতীকের কাছে আমার একটা নোট রয়ে গেছে। সেটা আজ রাতেই লাগবে—পড়তে হবে। বেশিক্ষণ লাগবে না—আমি দশটার মধ্যেই ফিরে আসব।'

সাইকেল নিয়ে রাস্তায় বেরোল অচ্যুত। আকাশের দিকে একবার তাকাল। সেখানে ঘোলাটে লালচে মেঘ অপেক্ষা করছে।

তখনই চোখ গেল মউলিদের বারান্দায়। একটা মেয়েলি ছায়া সেখানে দাঁড়িয়ে আছে—হাতে ধরা রেডিয়ো বাজছে।

সাইকেল চালিয়ে রাজীবদের বাড়ির দিকে যাওয়ার সময় অচ্যুত বেশ বুঝতে পারছিল ওর বুকের হালকা ভাবটা কখন যেন মিলিয়ে গেছে। তার বদলে মেঘলা আকাশটা চুপিচুপি সেখানে ঢুকে পড়েছে।

॥ পাঁচ ॥

রাজীবদের বাড়িতে পৌঁছে দেখল কুলদীপ আর প্রতীক আগেই সেখানে হাজির। অল্প আসবাব দিয়ে ছিমছামভাবে সাজানো ড্রয়িং-ডাইনিং-এ ওরা বসে রয়েছে। ওদের সামনে আখরোট কাঠের কারুকাজ করা টেবিলে কমলা রঙের শরবতের গ্লাস। ঘরের এককোণে রঙিন টিভিতে ডিসকভারি চ্যানেল চলছে।

অচ্যুত ঘরে ঢুকে একটা সোফায় বসতে-না-বসতেই দেখল, রাজীব আসছে।

রাজীবের গায়ে একটা নীলরঙের চাদর জড়ানো। ওর মাম্মি ওকে ধরে-ধরে নিয়ে আসছেন।

রাজীবের ফরসা মুখ বেশ ফ্যাকাসে। অচ্যুতদের দেখে মলিন হাসল।

মাম্মি ওকে যত্ন করে সাবধানে একটা সোফায় বসালেন। অচ্যুতদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কাল রাত থেকে হাই ফিভার—মাথা তুলতে পারছে না। ডক্টর দেখিয়ে আজ সন্ধের পর জ্বর একটু কমেছে। ওর ঘাড়ে পোকা-টোকা কী একটা কামড়েছে—তাই থেকেই হয়তো ইনফেকশান হয়েছে। এখানকার ড্রেনেজ সিস্টেমটাতো একেবারেই প্রিমিটিভ, নন-হাইজিনিক...সাফার করা ছাড়া আর তো কোনও উপায় নেই...।'

রাজীবের মাম্মির সাজগোজ বেশ নজরে পড়ার মতো। ডানহাতের দু-আঙুলে দুটো পাথর বসানো সোনার আংটি।

'তোমাদের সঙ্গে রাজুর কী ইমপর্ট্যান্ট ডিস্‌কাশন আছে—সেই সন্ধে থেকে ও একেবারে ছটফট করছে। তোমরা কথা বলো...,' অচ্যুতের দিকে ফিরে : 'আমি তোমার শরবত পাঠিয়ে দিচ্ছি—।'

চলে যেতে-যেতে রাজীবের দিকে ঘুরে তাকালেন মাম্মি : 'রাজু, বেশি স্ট্রেইন কোরো না। ডক্টর ব্যানার্জি তোমাকে অ্যাবসলিউট রেস্ট

নিতে বলেছেন...।'

মাম্মি চলে যেতে রাজীব শব্দ করে হাঁফ ছাড়ল। তারপর ওদের তিনজনের চোখের দিকে পালা করে তাকিয়ে বলল, 'আসল ব্যাপারটা আমি মাম্মি-বাপি কাউকে বলিনি। বললে শোরগোল করে থানা-পুলিশ ঘেঁটে একেবারে দুনিয়া মাথায় তুলবে। আমার বিপদের কথাটা ভাববে না।'

'কীসের বিপদ?' এক চুমুকে শরবত শেষ করে কুলদীপ জানতে চাইল।

'বলছি।' ঢোঁক গিলল রাজীব। ওর মুখে একটা আলতো ভয়ের ছায়া নেমে এল। ও অচ্যুতের দিকে তাকাল ঃ 'তুই কাল আমাকে পরেশদার দোকানে নামিয়ে দেওয়ার পর স্যাটাস্যাটের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল...।'

কুলদীপ চোখ বড়-বড় করে চাপা শিস দিয়ে উঠল।

অচ্যুত অপেক্ষা করতে লাগল। প্রতীক গালে হাত দিয়ে কৌতূহল-ভরা মুখে রাজীবের দিকে তাকিয়ে রইল। আর মাঝে-মাঝে আনমনাভাবে শরবতের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছিল।

'সত্যবানস্যারের সঙ্গে সাইকেল ছিল। বললেন, আমার সঙ্গে কী কথা আছে...যেতে-যেতে বলবেন। আমি কেক-টেক কিনে ওঁর সাইকেলে উঠলাম—সামনে রডের ওপরে বসলাম। স্যারের চোখে-মুখে একটা চাপা ফূর্তি টের পাচ্ছিলাম। কিন্তু কেন সেটা বুঝতে পারিনি।

'...সাইকেল চালিয়ে যেতে-যেতে স্যাটাস্যাট অঙ্ক নিয়ে খুব জ্ঞান দিতে লাগল।' অচ্যুতের দিকে ইশারা করে রাজীব বলল, 'তোর অঙ্কের মাথা নিয়ে খুব প্রেইজ করছিল। আর কথা বলতে-বলতে...।' রাজীবের চোখ সরু হয়ে এল ঃ 'আমার ঘাড়ের কাছে বারবার ঠোঁট ছোঁয়াচ্ছিল। আমার বিরক্ত লাগছিল...কিন্তু কেমন একটা ঘোরের মধ্যে যেন পড়ে গিয়েছিলাম। স্যাটাস্যাটের জড়ানো গলায় কথা শুনতে-শুনতে আমার ঝিম ধরানো নেশা মতন হয়ে গেল। ততক্ষণে সাইকেল ঘোষদের বাগানবাড়ি ছাড়িয়ে পুকুরের পাশের অন্ধকার রাস্তায় চলে এসেছে। আমি বললাম, "স্যার, এ-রাস্তা দিয়ে এলেন কেন?" আমার মাথার পেছন থেকে স্যাটাস্যাট খিলখিল করে হাসল। তারপর বলল, "এটাই তো তোর বাড়ি যাওয়ার শর্টকাট রে বোকা!"

'আমি কিন্তু জানতাম যে, ওটা শর্টকাট নয়—তবুও কিছু বলতে পারলাম না। কেমন যেন হিপনোটাইজ্‌ড হয়ে গিয়েছিলাম। নিজের ওপরে আর কোনও কন্ট্রোল ছিল না।

'স্যাটাস্যাট একটা বটগাছের তলায় ঝুপসি অন্ধকারে সাইকেলটা দাঁড় করাল। বটগাছের ঝুরির ফাঁক দিয়ে ঘোলাটে চাঁদ দেখা যাচ্ছিল। চারপাশে কেউ কোথাও নেই। পুকুরের দিক থেকে ব্যাঙের ডাক শোনা যাচ্ছিল।

'আমার বেশ ভয় করছিল, কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারছিলাম না। গলার ভেতরে কেউ যেন খানিকটা তুলো গুঁজে দিয়েছে। এমন সময় পুকুরের কালো জলে কোনও মাছ বোধহয় ঘাই মারল—ছপাৎ করে শব্দ হল। আর সঙ্গে-সঙ্গে ঘাড়ে কাঁটা ফোটার মতো ব্যথা পেলাম। তারপরই জায়গাটা চিনচিন করতে লাগল। আমি...।'

ডিসকভারি চ্যানেলে আচমকা বাঘের গর্জন শোনা গেল। ওরা চারজনেই সামান্য চমকে উঠল। এই গরমের মধ্যেও অচ্যুতের কেমন যেন শীত করছিল।

ওরা টিভির দিকে তাকিয়েছিল। তখনই দেখল, একজন মহিলা একগ্লাস শরবত নিয়ে ঘরে ঢুকছেন।

শরবতের গ্লাসটা টেবিলে রেখে তিনি চলে গেলেন। রাজীব গ্লাসটা তুলে নিয়ে অচ্যুতের হাতে দিল, 'নে, শরবত খা।'

অচ্যুত এক ঢোঁকে শরবতের গ্লাস অর্ধেকটা শেষ করে জানতে চাইল, 'তারপর?'

রাজীব দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করল ঃ

'...আমি অসাড় হয়ে সাইকেলের রডের ওপরে বসে রইলাম। নড়াচড়ার শক্তি নেই। স্যারও কোনও কথা বলছিলেন না। একটা ঘোরের মধ্যে সময় কেটে যেতে লাগল। চোখের সামনে থেকে চাঁদ মুছে গেল। ব্যাঙের ডাক আর শুনতে পাচ্ছিলাম না। শুধু চিনচিনে ব্যাপারটা টের পাচ্ছিলাম।

'...ওইভাবে কতক্ষণ কেটে গেছে জানি না। একসময় আবার চাঁদ দেখতে পেলাম, ব্যাঙের ডাকও শুনতে পেলাম। শরীরটা খুব উইক লাগছিল। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছিল। টের পেলাম, স্যার আমার ঘাড়ে আলতো করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন। জামার কলারটা তুলে দিয়ে ঘাড়ের কাছটা ভালো করে ঢেকে দিতে চাইলেন। তারপর বললেন, "আমার

দিকে একবার তাকা...।" আমি অন্ধ ভক্তের মতো ওঁর হুকুম মেনে তাকালাম...।'

রাজীব হঠাৎই শিউরে উঠল। পাশে বসে থাকা অচ্যুতের হাত খপ করে চেপে ধরল। কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, 'বাড়িতে এসব কথা একদম বলিনি। তোদের বলছি—।'

'তাকিয়ে কী দেখলি?' প্রতীক জিগ্যেস করল।

'দেখলাম...।' চোখ গোল-গোল করে তাকাল রাজীব। ওর মুখ আরও ফ্যাকাসে হয়ে গেল ঃ 'দেখলাম, স্যারের চোখ দুটো গাঢ় সবুজ—ধকধক করে জ্বলছে—আর তার মধ্যে দুটো কালো ফুটকি। ঠিক যেন বেড়াল বা চিতাবাঘের চোখ। চোখ তো নয়, মার্বেল পাথর বসানো! স্যার অদ্ভুতভাবে হেসে ভয়ানক গলায় বললেন, "কাউকে এসব বলবি না। তুই এখন আমার! আমার কথায় উঠবি, আমার কথায় বসবি, আমার কথায় চলবি। আমার ইশারা তোর কাছে আদেশ। এ-কথা মনে রাখিস।"

'আশ্চর্য! বিশ্বাস কর, স্যারের ওপরে আমার একটুও রাগ হল না। ছুটে পালাতেও ইচ্ছে করল না। পাথরের স্ট্যাচুর মতো স্যারকে দেখছিলাম, স্যারের কথা শুনছিলাম।

'এরপর স্যার সাইকেল চালিয়ে আমাকে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিলেন। কানের কাছে মুখ এনে সাপ-খেলানো সুরে অনেক কথা বললেন। কথাগুলো সব আমার মনে নেই। তবে একটা ঘোরের মধ্যে হেঁটে আমি বাড়ি এলাম। গলার পাশে, ঘাড়ের কাছটায় চুলকোচ্ছিল। হাত দিতেই কেমন চটচটে লাগল। দেখি রক্ত। তখনই আমি মাথা ঘুরে পড়ে গেছি। তারপর বাপি-মাম্মির হইচই, ডাক্তার ডাকাডাকি, কত কী কাণ্ড!

'বাড়িতে আমি ভয়ে কোনও কথা বলিনি। বলেছি, অন্ধকারে ওই পুকুরের কাছটায় কী একটা পোকা যেন কামড়ে দিয়েছে। কিন্তু তোদের সত্যি কথা বলছি, সত্যবানস্যারের ভয়ে আমি একেবারে কাঁটা হয়ে আছি। বারবার মনে হচ্ছে, কাল রাতের ব্যাপারটা পুরোপুরি স্বপ্ন—একবর্ণও সত্যি নয়। কিন্তু আসলে তো সত্যি! এখন তোরা আমাকে বাঁচা। কী করব বলে দে—।'

রাজীবের কথা শেষ হওয়ার পর কিছুক্ষণ সবাই চুপ করে রইল। কুলদীপ ওর কদমছাঁট চুলে হাত বোলাতে-বোলাতে টিভির দিকে তাকিয়ে

রইল। প্রতীক বয়স্ক মানুষের মতো ভুরু কুঁচকে ঠোঁট কামড়ে বসে। আর অচ্যুতের মনের ভেতরে তোলপাড় চলছিল।

কী করা উচিত এখন?

প্রতীক বিড়বিড় করে বলল, 'স্যাটাস্যাট আসলে ড্রাকুলা! আজকের যুগে এ তো বিশ্বাস করা মুশকিল!'

অচ্যুত ধীরে-ধীরে বলল, 'বিশ্বাস করতে কষ্ট হলেও ব্যাপারটা বোধহয় মিথ্যে নয়। তা ছাড়া পিশাচের আবার যুগ আছে নাকি!'

কুলদীপ বলল, 'আমি ওসব ভূত-টুতে বিশ্বাস করি না। রাজীব, তোর মনে হয় ভুল হয়েছে। তোকে সত্যি-সত্যিই কোনও পোকা-টোকা কামড়েছে।'

রাজীব চোখ বড় করে জানতে চাইল, 'তা হলে ওই সবুজ চোখ দুটোও ভুল?'

'না, মোটেই ভুল নয়,' জবাব দিল অচ্যুত, 'আমিও ওই সবুজ চোখ দেখেছি। স্যারের মধ্যে যে কিছু একটা গণ্ডগোল আছে সেটা আঁচ করেছিলাম। কিন্তু সেটা যে এইরকম তা বুঝতে পারিনি। রাজীব, তুই এখন যা—শুয়ে পড় গিয়ে। কয়েকটা দিন রাস্তায় বেরোস না। আমরা একটু ভেবে দেখি, কী করা যায়। তোর ফোন নাম্বারটা আমাকে দে—।'

রাজীব ফোন নম্বর বলল। অচ্যুত সেটা কয়েকবার বিড়বিড় করে আওড়ে মুখস্থ করে নিল।

এমন সময় রাজীবের মাম্মি ঘরে ঢুকলেন। রাজীবকে লক্ষ করে বললেন, 'রাজু, চলো, অনেকক্ষণ গল্প হয়েছে। এবারে ওষুধ লাগিয়ে রেস্ট নেবে। কাল ডক্টর ব্যানার্জি আবার চেক আপে আসবেন। তোমরা শরবত খেয়েছ তো?'

শেষ প্রশ্নটা অচ্যুতদের লক্ষ্য করে।

প্রতীক আর অচ্যুত গ্লাসের বাকি শরবত শেষ করে উঠে দাঁড়াল।

কুলদীপ হাঁ করে টিভিতে বাঘ আর বাইসনের লড়াই দেখছিল, অচ্যুত ওকে খোঁচা মারল। কুলদীপ ফিরে তাকাতেই ওকে উঠতে ইশারা করল।

'আসি, আন্টি।'

রাজীবকে 'টা-টা' করে ওরা তিনজনে দরজার দিকে এগোল। হঠাৎই প্রতীক ঘুরে দাঁড়িয়ে রাজীবকে বলল, 'কাল তোকে ফোন করব—।'

তারপর মাম্মিকে আড়াল করে এক চোখ টিপে হাতের ইশারায় বলতে চাইল, 'কোনও ভয় নেই।'

রাস্তায় বেরোতেই কুলদীপ অচ্যুতকে বলল, 'কী রে, স্যাটাস্যাটের সবুজ চোখের ব্যাপারটা আমাদের বলিসনি তো!'

'ভয়ে বলিনি। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।'

প্রতীক বলল, 'স্যাটাস্যাট হেভি ডেঞ্জারাস। কিন্তু কী করে হঠাৎ এরকম চেঞ্জ হয়ে গেল বল তো?'

'হয়তো ওর ওপরে পিশাচ ভর করেছে।' অচ্যুত বলল, 'রক্তপিশাচ ড্রাকুলা যেমন ভর করত—আমি টিভিতে দেখেছি।'

প্রতীক কপালে ভাঁজ ফেলে বলল, 'বানজারার গোরু-বাছুরকেও কি তা হলে পোকা কামড়েছে?'

কুলদীপ আর প্রতীকের দিকে তাকাল অচ্যুত। একটু চুপ করে থেকে বলল, 'হ্যাঁ, স্যাটাস্যাট-পোকা।'

ওর কথায় কেউ হাসল না।

আর সঙ্গে-সঙ্গেই ঝিরঝির করে বৃষ্টি শুরু হল।

ওরা তিনজন যে-যার সাইকেলে উঠে রওনা হয়ে পড়ল। যেতে-যেতে কুলদীপ চেঁচিয়ে বলে গেল, 'কাল স্কুলে দেখা হবে—।'

রাস্তার দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যাওয়ায় অন্ধকার আরও বেড়ে গেছে। সাইকেল রিকশা, স্কুটার, বা লোকজন চোখে পড়ে কি পড়ে না। অচ্যুত সাইকেল চালাচ্ছিল বটে, কিন্তু ওর মন রাস্তার দিকে ছিল না। দুটো ধকধকে ক্ষুধার্ত সবুজ চোখ ওকে তাড়া করে বেড়াচ্ছিল।

ও মনে-মনে ঘটনাগুলো যতই চিন্তা করছিল ততই যেন সব জট পাকিয়ে যাচ্ছিল।

পুলিশে খবর দেওয়ার কোনও মানে হয় না, কারণ, কেউ ওদের কথা বিশ্বাস করবে না।

তা হলে কী করা যায়? সত্যবানস্যারকে ওরা দশ-পনেরোজন মিলে ঘিরে ধরে কোণঠাসা করবে? জবাবদিহি চাইবে? নাকি হেডস্যারের কাছে দলবেঁধে গিয়ে সত্যবানস্যারের নামে নালিশ করবে?

তখনই অমিয়স্যারের কথা মনে পড়ল।

প্রমাণ চাই, প্রমাণ। স্যাটাস্যাটকে লাল হাতে ধরতে হবে। কিন্তু সেই

সুযোগ কি কখনও পাওয়া যাবে?

এইসব এলোমেলো চিন্তা করতে-করতে অচ্যুত যখন বাড়ি ফিরল তখন দেখল মা একরাশ দুশ্চিন্তা মুখে নিয়ে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

একইসঙ্গে ও চোখের কোণ দিয়ে দেখতে পেল, মউলিদের বাড়ির দোতলার বারান্দায় সেই মেয়েলি ছায়াটা এখনও একইরকমভাবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

মা বলল, 'সেই কখন থেকে তোর জন্যে দাঁড়িয়ে আছি! একে রাত হয়েছে, তার ওপর বৃষ্টি—একটা বিপদ হলে তখন কী হবে বল তো!'

অচ্যুত সামান্য হাসল। সাইকেলটা হাঁটিয়ে নিয়ে মা-কে পাশ কাটিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকল। মা-কে ও বলতে পারল না, 'বিপদ হলে তখন কী হবে' নয়—এর মধ্যেই ও বিপদের জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে। অভিমন্যুর মতো ওকে চক্রব্যূহ ভেদ করার চেষ্টা করতে হবে। যদি ভেদ করতে না পারে, তা হলে অভিমন্যুর মতোই হয়তো ওর...।

অচ্যুত আর ভাবতে পারল না।

রাজীবের ঘটনাটা ওর শিরদাঁড়ায় বরফ জমিয়ে দিয়েছে।

॥ ছয় ॥

পরদিন স্কুলে গিয়ে অচ্যুতরা জোট পাকাতে শুরু করল।

ও, কুলদীপ, প্রতীক, বাসব, সৌরভ সবাই বন্ধুদের রাজি করিয়ে কাছাকাছি ডেস্কে বসল। আর ক্লাসের মাঝে ফাঁক পেলেই ফিসফাস করে আলোচনা করতে লাগল।

একটার পর একটা ক্লাস হয়ে যাচ্ছে, ওদের সেদিকে মন নেই। আনমনা হওয়ার জন্য বাসব ভূগোলের পিরিয়ডে কালীপদস্যারের কাছে বকুনিও খেল। কিন্তু সত্যবানস্যারের ব্যাপারটা এত সাঙ্ঘাতিক যে, ওরা কেউই পড়াশোনায় মন দিতে পারছিল না।

টিফিনের ঘণ্টা যখন পড়ল তখনও ওরা ক্লাসে বসে রইল। যে দু-তিনজন ঘরে বসেই টিফিন খায়, কুলদীপ তাদের মাঠে যেতে বলল, 'তোরা নীচে গিয়ে টিফিন খা। আমাদের একটু প্রাইভেট কথা আছে।'

কুলদীপকে সবাই একটু সমীহ করে। তাই কেউই কথা বাড়াল না।

অচ্যুতের কাছে সব শোনার পর বাসব আর সৌরভ তো একেবারে থ হয়ে গেল।

প্রতীক বলল, 'সেইজন্যেই তুই আর কুলদীপ অত গুজগুজ করতিস!'

কুলদীপ একটু হাসল। বলল, 'চিন্তা করে দেখ, ব্যাপারটা কীরকম আজগুবি আর সিরিয়াস।'

বাসব বলল, 'এখন কী করবি?'

অচ্যুত বলল, 'কুলদীপ বলছে স্যাটাস্যাটকে চোখে-চোখে রাখতে—যদি হাতেনাতে ধরা যায়।'

প্রতীক গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়ল : 'হুঁ—প্রমাণ না পেলে কিছু করা মুশকিল...।'

'স্যাটাস্যাটও আমাকে এই কথা বলেছিল—সবুজ চোখ দেখানোর

সময়। প্রমাণ না পেলে কেউ আমাদের কথা বিশ্বাস করবে না।'

সৌরভ উত্তেজিতভাবে বলল, 'আমার ছোট একটা অটোমেটিক ক্যামেরা আছে। ফটো তুলে নিলে কেমন হয়! সেটাই তো সবচেয়ে বড় প্রমাণ—।'

প্রতীক হাসল, 'স্যাটাস্যাট কি তোর ক্যামেরার সামনে চোখ সবুজ করে পোজ দিয়ে দাঁড়াবে?'

'কিন্তু কিছু একটা তো করতে হবে!'

বাসব হাতের ইশারায় সবাইকে চুপ করতে বলল। তারপর বলল, 'আমাদের পাঁচজনের কাজ এখন একটাই—প্রমাণ খোঁজা। সৌরভ যদি ক্যামেরা নিয়ে কিছু করতে পারে তো করুক। আর আমরা সত্যবানস্যারের ওপরে কড়া নজর রাখব। শুধু স্কুলে নয়, স্কুলের বাইরেও। এই নজরদারির কাজে দরকার হলে আরও কয়েকজনকে দলে নেব।'

বাসবের কথাটা কুলদীপের মনে ধরল। প্রতীকও মাথা নেড়ে সায় দিল। বলল, 'স্যার একা—আর আমরা অনেক। আমাদের সুবিধে অনেক বেশি।'

অচ্যুত বলল, 'আমাদের গ্রুপের বাইরে কেউ যেন কিছু না জানতে পারে। ক্লাস টেনের দাদাদেরও কিছু বলার দরকার নেই। এখন সবকিছু সিক্রেট রাখাটা মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট।'

'তুই বাড়িতে কিছু বলিসনি?' কুলদীপ জিগ্যেস করল।

'না, এখনও বলিনি। বললে পর হইচই বেধে যাবে—হয়তো এ-স্কুল ছাড়িয়ে দিয়ে অন্য স্কুলে ভরতি করে দেবে। আমার মা যা ভিতু!'

টিফিন শেষ হওয়ার ঘণ্টা না বাজা পর্যন্ত ওদের জল্পনা-কল্পনা চলল। স্কুল ছুটির পর মাঠের সাইকেল-স্ট্যান্ডের কাছে দাঁড়িয়ে ওরা না-ফুরোনো কথা বলছিল।

কুলদীপ বলল, 'আগামীকালের ম্যাচ বাতিল করতে হবে।'

সৌরভ বলল, 'ওর ক্যামেরাটায় নতুন ফিল্ম ভরে ও তৈরি হবে।'

বাসব বলল, 'সত্যবানস্যারের ওপরে সবসময় নজর রাখার জন্য পাড়ার বন্ধুবান্ধবদেরও বলতে হবে। কারণ, বাসবরা যদি রাস্তাঘাটে, স্টেশনে, সব জায়গায় স্যারের পিছু নেয় তা হলে স্যার সহজেই গোলমালটা ধরে ফেলবেন।'

ওরা চারজন বাসবের কথায় সায় দিল।

অচ্যুত আনমনা হয়ে কী ভাবছে দেখে প্রতীক ওকে ঠেলা মারল:

'কী রে, কী ভাবছিস?'

'ফটো তোলা যাবে কী করে তাই ভাবছি। সৌরভ, তোর ক্যামেরা যেন সোমবার থেকে রেডি থাকে—।'

সৌরভ প্রবল উৎসাহে ঘাড় কাত করে বলল, 'কোনও চিন্তা নেই। কালকেই ফিল্ম কিনে ক্যামেরা লোড করে নেব।'

অচ্যুত বলল, 'রাতে সবাই রাজীবকে ফোন করে একটু সাহস দিস...নইলে ওর ভয় কাটবে না। তা ছাড়া ওর শরীর কেমন আছে, সেটাও জানা দরকার।'

কুলদীপ, প্রতীক আর সৌরভ ঘাড় নাড়ল। বাসবের বাড়িতে ফোন নেই।

ছুটির পর ছেলের দল স্রোতের মতো মাঠ পেরিয়ে লোহার গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। সেই স্রোত এখন একেবারে ফিকে হয়ে এসেছে।

ওরা দেখল, সত্যবানস্যার আরও দুজন স্যারের সঙ্গে স্কুল থেকে বেরোচ্ছেন। ওঁদের সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলছেন। দেখে মনেই হয় না এতগুলো ভয়ঙ্কর ঘটনা সত্যি।

কুলদীপ হঠাৎই জিগ্যেস করল, 'অ্যাই, নেক্সট উইকে স্যারস্যারের কোচিং-এর কী হবে?'

অচ্যুত বলল, 'আমরা যেমন যাই যাব। শুধু রাজীবকে যেতে বারণ করব। আর শোন, স্যার যদি কাউকে একা ডাকেন তা হলে কেউ যাবি না। স্কুলে অতটা ভয় নেই...বেশি ভয় বাইরে।'

অচ্যুত লক্ষ করল, সত্যবানস্যার যেতে-যেতে ঘাড় ঘুরিয়ে ওদের জটলার দিকে একবার তাকালেন। ছোট্ট করে হাসলেন বলেও মনে হল। অবজ্ঞার হাসি।

একটু পরেই ওরা যার-যার বাড়ির দিকে রওনা হল।

আকাশে মেঘ আছে, তবে তেমন ঘন নয়। বাতাস বইছে এলোমেলো। অচ্যুতের চুল হাওয়ায় উড়ছিল। মাঠে-ঘাটে কাশফুল ফুটেছে। জানিয়ে দিচ্ছে পুজোর আর খুব দেরি নেই। কিন্তু বর্ষার যা ঢং এবার, মনে হয়, মা দুর্গাকে প্রণাম না করে সে বাড়ি ফিরবে না।

দোকানপাটে ভিড় তেমন নেই। পুজোর বাজার এখনও লাগেনি। পুজো-পুজো গন্ধটাও অচ্যুতের নাকে আসছে না। অথচ আর কিছুদিন পরেই পুজোর ছুটি পড়বে। ওর বন্ধুদের অনেকেই বাইরে বেড়াতে যাবে। অচ্যুতরা খুব একটা যায় না। গতবারে শুধু দীঘা গিয়েছিল।

পথে একটা চুড়িদারের দোকান দেখতে পেল অচ্যুত। সেখানে অনেক বাহারি রঙের চুড়িদার ঝুলছে। তার মধ্যে একটা ওকে মউলির কথা মনে পড়িয়ে দিল। মউলির ওইরকম রঙের একটা চুড়িদার আছে।

কাল রাতে মউলি অতক্ষণ ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল কেন? অচ্যুত কখন ফেরে সেটা দেখার জন্য?

মউলিকে সত্যবানস্যারের ব্যাপারটা বলতে পারলে ভালো লাগত। কিন্তু অচ্যুত তো এখনও পর্যন্ত মা-বাপিকেও কিছু বলেনি।

সময় আসুক, তখন বলবে।

রবিবার সকালে একটা ভয়ানক খবর অচ্যুতদের এলাকাটাকে একেবারে ঝুঁটি ধরে নেড়ে দিল।

ওদের বাড়ি থেকে প্রায় দু-কিলোমিটার দূরে একটা বড় ধানকল আছে। তার পাশেই প্রকাণ্ড মাঠ। জেলা চ্যাম্পিয়ানশিপের বড়-বড় খেলা সব এই মাঠে হয়। এলাকার লোকজন মাঠটাকে ধানকলের মাঠ বলে।

সেই মাঠে ভোরবেলা দু-দুটো মৃতদেহ পাওয়া গেল।

দুটো মৃতদেহই রক্তহীন, ফ্যাকাসে। তাদের ঘাড়ের পাশে গভীর দুটো দাঁতের দাগ।

এরকম অদ্ভুত মৃতদেহ এলাকার কেউ কখনও দেখেনি।

যারা নিজের চোখে মৃতদেহ দুটো দেখেছে, তারা বলল, 'ঠিক মনে হবে ঘাড়ে পাইপ ঢুকিয়ে কোনও পিশাচ কোক কিংবা পেপসি খাওয়ার মতো রক্ত টেনে নিয়েছে।'

অচ্যুত পাড়ার হারানদার মুদিখানা দোকানে গুঁড়ো হলুদ আর চিঁড়ে কিনতে গিয়েছিল। সেখানে খবরটা শুনেই ওর গা গুলিয়ে উঠল। রাজীবের কথাগুলো মনে পড়ে গেল পলকে।

যারা মারা গেছে তারা বিহারি। ধানকলে কাজ করত, মাঝে-মাঝে

ছুটি-ছাটায় দেশে যেত। দেশোয়ালি ভাইদের সঙ্গে জোট বেঁধে ধানকলের কাছাকাছি ঝুপড়িতে থাকত।

কাল রাতে ওরা দুজনে হয়তো নেশা-টেশা করতে বেরিয়েছিল...তারপর রাত করে মাঠের ওপর দিয়ে ফেরার সময় ওইরকম মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে গেছে।

বহু চেষ্টা করেও খুনের উদ্দেশ্য কেউ খুঁজে পেল না। নেশাগ্রস্ত দুজন গরিব দেহাতিকে কে খুন করতে চাইবে? তা ছাড়া ঘাড়ের পাশে ওইরকম বীভৎস একজোড়া গর্তই বা কে করবে?

অনেকেই ধরে নিল, এ কোনও অপদেবতার কাজ।

পুলিশ ফাঁড়ির বড়বাবু স্থানীয় লোকজনকে মামুলি কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করে ডেডবডি চালান করে দিয়ে দায় সারলেন।

অচ্যুত বাড়ি ফিরে মা-বাপিকে এই জোড়া-খুনের খবর দিল।

মা তো ভয়েই সারা। বলল, 'কোচিং থেকে ফেরার সময় একা-একা ফিরবি না। এরকম কাণ্ড জীবনে শুনিনি বাবা!'

বাপি বলল, 'দ্যাখো গিয়ে, কারা হয়তো রক্তের ব্যাবসা করার জন্যে সিরিঞ্জ দিয়ে সব রক্ত টেনে নিয়েছে!'

অচ্যুত বলল, 'তা হলে এক-একজনের ঘাড়ে দুটো করে সিরিঞ্জের ফুটো কেন?'

'কেন আর, দুটো সিরিঞ্জে তাড়াতাড়ি রক্ত টানা যাবে—।'

বাপির স্বভাব হচ্ছে যে-কোনও সমস্যাকে চটজলদি সমাধান করে দেওয়া। যেমন এখন। বাপি যুক্তি দিয়ে ঠিক বুঝিয়ে দেবে রক্তের চোরাব্যাবসার জন্যই ওই দুজন মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। যদি প্রত্যেকের ঘাড়ে পাঁচটা করেও ফুটো থাকত, তা হলেও বাপির ব্যাখ্যা করতে কোনওরকম অসুবিধে হত না।

এই জোড়া খুনের ঘটনাটার কথা শুনে অচ্যুত বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ও ভেবেছিল, আজই স্কুলের ব্যাপারগুলো মা-বাপিকে খুলে বলবে। কিন্তু বাপির দায়সারা যুক্তি আর ব্যাখ্যা শুনে ও দমে গেল। কে জানে, ওর কথা শুনে বাপি হয়তো আজগুবি বলে হেসেই উড়িয়ে দেবে!

সত্যবানস্যার ঠিক বলেছিলেন। এখন বিজ্ঞানের যুগ। সবাই শুধু প্রমাণ

চাইবে। প্রমাণ না দিতে পারলে অচ্যুতের কথা কেউ বিশ্বাস করবে না। এমনকী মা-বাপিও হয়তো বিশ্বাস করবে না।

কিছুক্ষণ কী ভাবল ও। তারপর ভেতরের ঘরে গিয়ে সৌরভকে ফোন করল।

ফোন করতেই সৌরভ উত্তেজিতভাবে বলল, 'জোড়া মার্ডারের খবর পেয়েছিস তো?'

'হ্যাঁ—।'

'শোন, কুলদীপ আমাকে ফোন করেছিল, ওর পাড়ার দু-বন্ধুকে ও স্যাটাস্যাটের পেছনে লাগিয়ে দিয়েছিল। তারা স্যাটাস্যাটকে কাল রাতে ধানকলের মাঠে ঘোরাঘুরি করতে দেখেছে।'

'ক'টার সময়?'

'এই ধর দশটা। মাঠের ধারে জঙ্গলের কাছটায় স্যাটাস্যাট ঘাপটি মেরে দাঁড়িয়েছিল। ওর সঙ্গে আরও একজন ছিল—তবে সে অন্ধকারে গাছের আড়ালে থাকায় ওরা লোকটাকে দেখতে পায়নি। স্যাটাস্যাট লোকটার সঙ্গে নীচু গলায় কথা বলছিল। কুলদীপের বন্ধুরা কোনও কথা শুনতে পায়নি। তারপর...রাত বাড়ছিল বলে ওরা ভয়ে পালিয়ে এসেছে...।'

তা হলে কি দুটো খুন দুজনের কীর্তি? স্যাটাস্যাট একা করেনি?

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর অচ্যুত বলল, 'শোন, তোকে যে-জন্যে ফোন করেছি। তোর ক্যামেরাটা রেডি আছে তো?'

'হ্যাঁ, রেডি—।'

'কাল স্কুলের পর তোর বাংলা কোচিং আছে না?'

'হ্যাঁ—তো কী হয়েছে?'

'তুই কোচিং সেরে ক্যামেরা সঙ্গে নিয়ে আমাকে মিট করবি। পরেশদার কেকের দোকানের সামনে। সেখান থেকে আমরা স্যাটাস্যাটের কোচিং-এ যাব...শুধু তুই আর আমি...তার বেশি গেলে সব ভন্ডুল হয়ে যাবে।'

সৌরভ বলল, 'ও. কে.।'

'শোন, ক্যামেরা নিয়ে যে আমরা কোথায় যাচ্ছি সেটা আমাদের গ্রুপের বাইরে কাউক্কে বলবি না।'

'আচ্ছা।' একটু চুপ করে থেকে তারপর সৌরভ জানতে চাইল, 'কাল স্যাটাস্যাটের ফটো তুলবি?'

'হ্যাঁ। কাল তা হলে ঠিক সাতটায়...।' রিসিভার নামিয়ে রাখল অচ্যুত। তারপর পড়াশোনা নিয়ে বসল।

বই-খাতা চোখের সামনে খোলা, অক্ষর কিংবা শব্দগুলো দিব্যি নজরে পড়ছে—কিন্তু মাথায় সেগুলোর কোনওরকম অর্থ তৈরি হচ্ছিল না। সেখানে মাইলের পর মাইল লম্বা ঘুড়ির সুতো যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। আর জটের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে অচ্যুত হাঁসফাঁস করছিল।

বারবার রাজীবের কথা মনে পড়ছিল। খুব কপালজোরে ও বেঁচে গেছে। নইলে ধানকলের মাঠের ঘটনার মতোই ওকে পুকুরপাড়ে আগাছার জঙ্গলে ভোরবেলা পাওয়া যেত।

অচ্যুতের বুকের ভেতরে মেঘ ডেকে উঠল।

রাজীবও নিশ্চয়ই ধানকলের মাঠের খবরটা শুনেছে! ছোট জায়গায় খবর ছড়াতে বেশি সময় লাগে না।

এ খবর কানে গেলে রাজীব হয়তো আরও ভয় পেয়ে যাবে।

নানান চিন্তায় দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই রাজীবকে ফোন করল অচ্যুত।

'হ্যালো—।'

ওপাশ থেকে কোনও মহিলা ইংরেজিতে রাজীবদের ফোন নম্বরটা বললেন। গলা শুনে মনে হল রাজীবের মাম্মি।

'রাজীব আছে?'

'হু ইজ স্পিকিং প্লিজ?'

'আমি অচ্যুত—রাজীবের ক্লাসমেট...।'

'হ্যাঁ, ধরো—।'

'একটু পরেই রাজীব ফোনে কথা বলল, 'অচ্যুত, খবরটা শুনেছিস?'

'ধানকলের মাঠের কেসটা?'

'হ্যাঁ।' রাজীবের গলায় চাপা উত্তেজনা।

'সেইজন্যেই তোকে ফোন করেছি। একটুও ভয় পাবি না—আমরা শিগ্‌গিরই যা-হোক কিছু একটা ব্যবস্থা করছি। স্যাটাস্যাটের কেসটা আমরা এসপার-ওসপার করে ছাড়ব।'

'শোন...একটা ব্যাপার...মানে...।' থতিয়ে থতিয়ে বলতে চাইল রাজীব।'

'কী হয়েছে?'

'স্যাটাস্যাট কাল রাতে আমাকে ফোন করেছিল...।'

'বলিস কী! ...কী বলল?' অচ্যুতের বুকের ভেতরে ড্রাম বাজতে শুরু করল।

'আমাকে ওর কোচিং-এ যাওয়ার কথা বলছিল।'

'সে কী! কাল তো কোচিং ছিল না।'

'সেইজন্যেই তো ডাকছিল। বলছিল, আমার সঙ্গে ওর একা-একা কী দরকার...তাই..।'

'খবরদার যাবি না!' চেঁচিয়ে উঠল অচ্যুত।

'শেষ পর্যন্ত মাম্মির ধমক খেয়ে যাইনি। তবে...তবে ভীষণ যেতে ইচ্ছে করছিল...।' অপরাধীর সুরে বলল রাজীব, 'তুই বিশ্বাস করবি না, স্যার কীরকম অদ্ভুত গলায় আমাকে ডাকছিলেন। ঠিক যেন নেশা ধরানো ঘুমপাড়ানি গান। অনেকটা গল্পের নিশির ডাকের মতো। বারবার বলছিলেন, "আসতে তোকে হবেই। আমার ডাক তুই ফিরিয়ে দিতে পারবি না। আজ না হয় কাল তোকে আসতেই হবে। আমার তেষ্টা তোর রক্তে আগুন জ্বালিয়ে দেবে, তোকে পাগল করে দেবে। তোর আমার যে রক্তের সম্পর্ক, তাকে কখনও ছিন্ন করা যায় না। কখ্খনও না।"

'...তুই বিশ্বাস কর, অচ্যুত—আমি তখন মাতালের মতো হয়ে গিয়েছিলাম। স্যার ছাড়া আমি আর তখন কিচ্ছু ভাবতে পারছিলাম না। মাথাটা হঠাৎ কেমন টলে গিয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম। টেবিলের একটা কোণা ধরে সামলে নিলাম। মাম্মি একটু দূরে বসে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিল। আমাকে টলে যেতে দেখেই ছুটে আমার কাছে এসে আমাকে ধরে ফেলল। তারপরই...।'

'তারপর কী?'

'তারপর মাম্মির সঙ্গে আমার কী ঝামেলা! মাম্মি আমাকে কিছুতেই বাড়ি থেকে বেরোতে দেবে না, আর আমি বেরোবই! শেষ পর্যন্ত মাম্মির ধমক খেয়ে...।'

রাজীব হঠাৎ ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল।

অচ্যুত ওকে কী বলবে ভেবে পেল না। রাজীব কাঁদছে কেন সেটাও ঠিক বুঝে উঠতে পারল না।

কান্না থামিয়ে ভাঙা গলায় রাজীব বলল, 'কাল আমি খুব জোর বেঁচে



...নানান চিন্তায় দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই রাজীবকে ফোন করল অচ্যুত।

গেছি, না রে?'

অচ্যুত অবাক গেল, 'কেন বল তো?'

'আমি গেলাম না বলেই হয়তো ধানকলের মাঠের লোক দুটো খতম হয়ে গেল।'

'এসব তুই কী বলছিস!'

'ঠিকই বলছি। স্যারের সেই ডাকের টান যে কী মারাত্মক সে তোকে আমি বলে বোঝাতে পারব না।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রাজীব ধরা গলায় জানতে চাইল, 'তোরা শেষ পর্যন্ত আমাকে ধরে রাখতে পারবি তো? তোদের ব্যাগ থেকে আর কখ্খনও আমি টাকা চুরি করব না...বিশ্বাস কর।' রাজীব আবার কাঁদতে শুরু করল।

ওর কান্নাটা এমন যেন ও জেনে গেছে, ওর কপালে কেউ সুনিশ্চিতভাবে কাটা চিহ্ন এঁকে দিয়েছে।

অচ্যুতের খুব কষ্ট হল। ও বলল, 'তুই মিছিমিছি কাঁদছিস। তোর কোনও ভয় নেই। আমি এক্ষুনি কুলদীপ, প্রতীকদের ফোন করছি। আধঘণ্টার মধ্যে আমরা তোর বাড়িতে যাচ্ছি। আন্টিকে আমাদের জন্যে শরবত তৈরি করে রাখতে বল...।

ফোন ছেড়ে দিল অচ্যুত।

ওর শরীরটা কেমন অবশ লাগছিল। দিশেহারা ভাবে ও যে-কোনও একটা পথ খুঁজে বেড়াচ্ছিল।

॥ সাত ॥

সোমবার সন্ধে সাতটার সময় সৌরভ পরেশদার কেকের দোকানের সামনে এল।

অচ্যুত আগে থেকে সাইকেল নিয়ে কেকের দোকানের পাশে একটা সাইকেল সারানোর দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। সৌরভকে দেখেই ওর দিকে এগিয়ে গেল। চাপা গলায় জিগ্যেস করল, 'ক্যামেরা এনেছিস তো?'

সৌরভ মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বলল।

'চল যেতে-যেতে প্ল্যানটা বলছি...।'

সাইকেলে উঠে পড়ল অচ্যুত। সৌরভও সাইকেল নিয়ে ওর পাশে-পাশে চলল।

সরু রাস্তায় ওদের বেশ কসরত করে সাইকেল চালাতে হচ্ছিল। আজ সারাদিনে এক ফোঁটাও বৃষ্টি হয়নি, তাই রাস্তা মোটামুটি শুকনো। তবে বাতাস থমকে গিয়ে একটা গুমোট গরম চেপে বসেছে।

রাস্তায় মোটামুটি ভিড়। তারই মধ্যে দুটো সাইকেল-ভ্যান মাইক লাগিয়ে আগামী রবিবারে কী একটা মিটিং হবে বলে প্রচার চালাচ্ছে। 'দলে-দলে যোগ দিন' কথাটা বারবার ওদের কানে এসে ঝাপটা মারছিল।

কোনওরকমে যানজট কাটিয়ে সাইকেল-ভ্যান দুটোকে পেরিয়ে গেল ওরা। তারপর জোরে প্যাডেল করতে শুরু করল।

কাল বিকেলে অচ্যুত, প্রতীক, কুলদীপ আর বাসব রাজীবের বাড়িতে গিয়েছিল। ওকে যতটা সম্ভব ভরসা দিয়ে এসেছে। কিন্তু অচ্যুত বুঝতে পারছিল, একটা সাংঘাতিক ভয় রাজীবের মনে গেঁথে গেছে। ওর কাছে ঘণ্টাদেড়েক থেকে তারপর অচ্যুতরা যার-যার বাড়ি ফিরে গেছে।

সাইকেল চালাতে-চালাতে সৌরভ আর অচ্যুত স্কুলের কাছে চলে

এল। স্কুল পেরিয়ে, পুকুর পেরিয়ে, যতই এগোতে লাগল রাস্তার লোকজন ততই ফিকে হতে লাগল। সেই সঙ্গে আলোও।

বর্ষার টইটম্বুর নালা থেকে ব্যাঙের দল ডাকছিল। তার সঙ্গে তালে তাল মিলিয়ে ঝিঁঝির দল সঙ্গত করছিল। বড়-বড় গাছের মাথা আকাশের মেঘের সঙ্গে কখন যে মিশে গেছে সেটা ঠাহর করা যাচ্ছিল না। পথের এখানে-ওখানে কয়েকটা ঝুপড়ি-দোকানে পান-বিড়ি-সিগারেট আর চা বিক্রি হচ্ছে। তার টিমটিমে আলো দোকান ছাড়িয়ে রাস্তায় পৌঁছতে পারছে না।

একটু পরেই সত্যবানস্যারের কোচিং-এ পৌঁছে গেল ওরা।

দেড়খানা ঘর নিয়ে পলেস্তারা-খসা একটা একতলা বাড়ি। তার একপাশে টিনের চাল। বাড়ির ডানপাশে আর পিছনদিকে গাছ-আগাছার দল যেমন খুশি বেড়ে উঠেছে। আর বাঁ-দিকে একটা জং-ধরা ঘাড় কাত করা টিউবওয়েল।

বাড়ির বাইরে আলো বলতে হাতদশেক দূরে ইলেকট্রিক পোস্টের মাথায় ঝোলানো একটা বাল্‌ব।

এই আস্তানাটা ভাড়া নিয়ে সত্যবানস্যার কোচিং চালান।

বড় ঘরটার চারটে ছোট-ছোট জানলা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছিল। জানলাগুলো একটু উঁচুতে হওয়ায় শুধু ঘরের ড্যাম্প ধরা দেওয়াল চোখে পড়ছে।

কোচিং-এর ঘর থেকে একটু দূরে সাইকেল থামাল অচ্যুত আর সৌরভ। আগাছার জঙ্গলের ওপরে সাইকেল দুটো ওরা কাত করে শুইয়ে দিল। তারপর অচ্যুত নীচু গলায় সৌরভকে বলল, 'তুই আস্তে-আস্তে পেছনদিকে চলে যা। সাবধানে জানলা দিয়ে উঁকি মারবি। যেই দেখবি স্যাটাস্যাট পিকিউলিয়ার কিছু করছে অমনি ফটো তুলে নিবি। শিয়োর হওয়ার জন্যে দরকার হয় দু-তিনটে শট নিবি। তারপর সোজা সাইকেল নিয়ে পালাবি—কোনওদিকে তাকাবি না। রাতে তোর সঙ্গে আমি ফোনে কথা বলে নেব।'

সৌরভের মুখে আলো-ছায়া নড়ছিল। ওকে একটু যেন বিভ্রান্ত দেখাল। ও জিগ্যেস করল, 'স্যাটাস্যাট হঠাৎ পিকিউলিয়ার কিছু করবে কেন?'

অচ্যুত কোচিং ক্লাসের দরজার দিকে তাকিয়ে ছিল। সেদিক থেকে

চোখ না ফিরিয়েই বলল, 'সে-দায়িত্ব আমার। তুই যা—রেডি হয়ে থাক...।' সৌরভকে ঠেলা মারল অচ্যুত।

সৌরভ পা টিপে-টিপে বাড়ির পিছনদিকে চলে গেল।

আর অচ্যুত সটান হেঁটে গিয়ে কোচিং ক্লাসের ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেল। ওর বুকের ভেতরে যে মেঘ গুড়গুড় করছিল সেটাকে ও জোর করে ভুলে যেতে চাইল।

'স্যার—।'

অচ্যুতের ডাকে সত্যবানস্যার চোখ তুলে তাকালেন।

ঘরে আর কেউ নেই। মেঝেতে পাতা শতরঞ্চির ওপরে বসে স্যার খাতা দেখছেন।

খুব শিগগিরই স্কুলে কোনও পরীক্ষা হয়নি। এগুলো নিশ্চয়ই স্যারের কোচিং-এ নেওয়া পরীক্ষার খাতা।

'তুই হঠাৎ এসময়ে?'

'স্যার, আপনার কথা আমি কাউকে বলিনি।'

হাসলেন সত্যবানস্যার : 'আয়, আয়—এখানে এসে বোস।'

অচ্যুত দরজার কাছে চটি ছেড়ে শতরঞ্চির ওপরে গিয়ে বসল। চোখের আন্দাজে মেপে দেখল স্যারের কাছ থেকে ওর দূরত্ব মাত্র তিন হাত।

স্যারকে লক্ষ করছিল অচ্যুত। তেলচকচকে চুল ব্যাকব্রাশকরে আঁচড়ানো। কিন্তু মাথা ঝুঁকিয়ে থাকায় কয়েকগোছা চুল চশমার ওপরে ঝুলে পড়েছে। আর গলার পাশ থেকে স্যারের নাকটাকে আরও খাড়া মনে হচ্ছে। আর গলার পাশে একটা শিরা ফুলে রয়েছে।

শিরাটার ওপরে চোখ পড়তেই অচ্যুতের বুকের ভেতরটা কেমন যেন শিরশির করে উঠল। ওর ছুটে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু মনের জোরে ইচ্ছেটাকে ও রুখে দিল। রাজীবের কথা মনে করে ও চোয়াল শক্ত করল।

সত্যবানস্যার আবার মাথা নীচু করে খাতা দেখছিলেন। সেই অবস্থাতেই জিগ্যেস করলেন, 'তোর পড়াশোনা কেমন হচ্ছে? তুই আমার সবচেয়ে ফেভারিট স্টুডেন্ট...।'

'পড়াশোনায় একদম মন বসছে না, স্যার।' অনুযোগ করে বলল অচ্যুত।

'কেন রে?' স্যার খাতার দিক থেকে চোখ সরালেন না।'

'আপনার জন্যে।'

চমকে চোখ তুলে তাকালেন : 'তার মানে!'

'আপনার...ইয়ে...ওইগুলো আমি এখনও... মানে... বিশ্বাস করে উঠতে পারছি না। মনে হচ্ছে, আমি সত্যি-সত্যিই ভুলভাল দেখেছি। আপনি কী করে দেওয়ালে হাঁটবেন! কী করে আপনার চোখ সবুজ হবে! অসম্ভব!' একদমে কথাগুলো বলে গেল অচ্যুত।

'ভুলভাল? অসম্ভব?' হাতে ধরা লাল পেন ছেড়ে দিলেন সত্যবানস্যার। ওঁর টকটকে ফরসা গালে অপমানের রক্ত ছুটে এল। কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়ে কোমলভাবে হাসলেন : যাকগে, ওসব কথা ছাড়। তুই কী দরকারে এসেছিস বল...।'

'আপনি রাগ করবেন না, স্যার। ওরকম অলৌকিক ব্যাপার...তাই সত্যি বলে মানতে কষ্ট হচ্ছে। আমি এরকম ভুল দেখলাম! আমি, স্যার, ঠিক বলে বোঝাতে পারছি না...।'

সত্যবানস্যার স্নেহের হাসি হাসলেন। বললেন, 'বুঝেছি...বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে তোর মেন্টাল ডিসটারবেন্স হচ্ছে। তা কী করলে তুই খুশি হবি? কী করলে তোর পড়ায় মন বসবে?'

কয়েকবার ঢোঁক গিলল অচ্যুত। তারপর দমকা হাওয়ার মতো বলে বসল, 'আমাকে আর-একবার করে দেখাবেন, স্যার?'

অদ্ভুত হেসে সত্যবানস্যার উঠে দাঁড়ালেন। স্যারকে অনেক লম্বা দেখাচ্ছিল। অচ্যুতের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে তিনি বললেন, 'ব্যস, এই?'

অচ্যুত দম বন্ধ করে ঘাড় নাড়ল। বলতে চাইল, 'হ্যাঁ—এই।'

স্যার ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দরজাটা বন্ধ করে ছিটকিনি এঁটে দিলেন। তারপর শূন্যে কয়েকবার হাত নেড়ে দরজার পাশের দেওয়ালে থাবা বসিয়ে দিলেন। এবং টিকটিকির মতো দেওয়ালে শরীরটাকে লেপটে সাঁতার কাটার ভঙ্গিতে এগোতে লাগলেন।

অচ্যুতের শীত করতে লাগল। ওর মনে হল, একটা কদাকার সরীসৃপ দেওয়ালে কিলবিল করছে। একটা ভয়ের চিৎকার ওর গলা ঠেলে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। প্রাণপণ চেষ্টায় অচ্যুত সেটাকে রুখে দিল। আর মনের জোরে শতরঞ্চির ওপরে স্থির হয়ে বসে রইল।

মাথার ওপরে পুরোনো সিলিং পাখার খটখট আওয়াজ হচ্ছিল। কিন্তু তারই মধ্যে অচ্যুত যেন কয়েকবার অটোমেটিক ক্যামেরার 'চিঁউ-চিঁউ' শব্দ শুনতে পেল।

স্যার দেওয়ালে হেঁটে বেড়াচ্ছিলেন। সেই অবস্থাতেই ঘাড় কাত করে হাসিমুখে অচ্যুতের দিকে তাকালেন : 'কিছুদিন আগে যখন এই ক্ষমতাটা আবিষ্কার করি তখন খুব তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম, বুঝলি। তারপর খেয়াল করলাম, আমার মনের ভেতরে কেমন একটা তোলপাড় চলছে। কখনও অঙ্ক মনে থাকে, কখনও থাকে না। কখনও চেনা লোককে চিনতে পারি, কখনও পারি না। প্রথম-প্রথম একটু অসুবিধে হচ্ছিল, কিন্তু দু-একদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা সয়ে গেল। আর...।' স্যার সিলিং-এর দিকে বেয়ে উঠতে লাগলেন : '...আর অদ্ভুত একটা তেষ্টা শুরু হল। যখন তেষ্টা পায় তখন কোনও জ্ঞান থাকে না। তখন তো আর আমি আমি থাকি না। আবার যখন তেষ্টা পায় না তো পায় না। অ্যাই, রাজীব কেমন আছে রে?'

'ভ্-ভালো আছে।' চাপা শব্দের টুকরোগুলো অচ্যুতের ঠোঁট থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে এল।

'ওকে আমি খুব ভালোবাসি। অবশ্য তোকেও ভালোবাসি...।' স্যার দেওয়াল বেয়ে মেঝের দিকে নেমে আসতে লাগলেন : 'তোকে ভালোবাসি তুই অঙ্কে চ্যাম্পিয়ান বলে। আর রাজীবকে...থাকগে, সে অন্য ব্যাপার।'

সার্কাস শেষ করে সত্যবানস্যার শতরঞ্চির ওপরে নেমে এলেন। হাততালি দেওয়ার ভঙ্গিতে শব্দ করে হাত ঝাড়লেন। চশমাটা ঠিক করে নাকের ওপরে সেট করে বললেন, 'কী রে, এবার তুই খুশি তো? এখন থেকে পড়ায় মন বসবে তো?'

অচ্যুত কেমন একটা ঘোরের মধ্যে ঘাড় নাড়ল। বাতাসে ঘরের জানলার পাল্লা নড়ে উঠল। একটা জংলি গন্ধ ঘরে ঢুকে পড়ল যেন।

'সবুজ চোখ কী আর দেখতে চাস?'

অচ্যুত মাথা নাড়ল এপাশ-ওপাশ। না, ও দেখতে চায় না।

'আসলে কী জানিস, এখন বিজ্ঞান-প্রযুক্তির যুগ। সবাই শুধু প্রমাণ চায়। তাই আমার এসব নিজের চোখে না দেখলে কেউই বিশ্বাস করবে না। প্রথম-প্রথম তো আমারই বিশ্বাস হতে চায়নি।' বলে মিহি গলায় খিলখিল করে হেসে উঠলেন সত্যবানস্যার।

স্যারের গলাটা হঠাৎ বদলে যাওয়ায় অচ্যুত একটু চমকে গেল। দেখল, স্যার হাসতে-হাসতেই মাথাটা এপাশ-ওপাশ দোলাচ্ছেন। স্যারের চোখ দুটো নিজে থেকেই কেমন কটা রঙের হয়ে যাচ্ছে।

স্যারের হাসিটা কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই গোঙানির মতো হয়ে গেল। তিনি খপ করে অচ্যুতের ডান হাতের কবজি চেপে ধরলেন। তীব্র চোখে তাকালেন ওর দিকে।

স্যারের হাতটা কী গরম! যেন জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে!

অচ্যুত ঝটকা মেরে হাতটা টেনে ছাড়াতে চেষ্টা করল। পারল না।

কেমন যেন ভাঙা খনখনে গলায় সত্যবানস্যার বললেন, 'বাঁচতে চাস তো এক্ষুনি পালা। তুই অঙ্কে চ্যাম্পিয়ান। তোর কোনও ক্ষতি হোক আমি চাই না।' ওর হাতটা ছেড়ে দিলেন স্যার। একরকম যেন ছুড়ে দিলেন অচ্যুতের কোলে ঃ 'পালা! পালা শিগগিরই!'

অচ্যুত লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল। একছুটে চলে গেল দরজার কাছে।

সত্যবানস্যার তখন শরীরটাকে পিছনদিকে বেঁকিয়ে বুকে হাত বোলাচ্ছেন আর বুক-ফাটা তেষ্টায় চাপা শব্দ করছেন, 'ওঃ! ওঃ!'

হঠাৎই নিজের ডানহাতে হিংস্র কামড় বসিয়ে দিলেন।

অচ্যুতের মাথাটা যেন ঘুরে গেল, দরজা ধরে নিজেকে সামলে নিল।

স্যারের চোখ দুটো গাঢ় সবুজ হয়ে গেল। হাত কামড়ে ধরা অবস্থাতেই তিনি অচ্যুতের দিকে মুখ তুলে তাকালেন। গোঙানির মতো শব্দ করে কিছু একটা বলতে চাইলেন। তারপর কামড়ে ধরা জায়গাটা প্রবল টানে শব্দ করে চুষতে লাগলেন।

এতক্ষণ গলা টিপে ধরে রাখা চিৎকারটা এইবার অচ্যুতের গলা দিয়ে বেরিয়ে এল। একটানে দরজা খুলে ও ছিটকে চলে এল বাইরে। চোখ-মুখে অসহ্য তাপ। মাথা ঝিমঝিম করছে। কোনওরকমে ও ছুটে গেল শুইয়ে রাখা সাইকেলের কাছে। তারপর অচ্যুত নামের একটা রোবট অমানুষিক গতিতে সাইকেল ছুটিয়ে দিল।

ঠিক তখনই ঝিরঝিরে বৃষ্টি নেমে পড়ল আকাশ থেকে।

অচ্যুতের ভয় ক্রমশ কমছিল। কারণ, ও বোধহয় পালটে যাওয়া

সত্যবানস্যারের ধরনধারণ এখন অনেকটা স্পষ্টভাবে আঁচ করতে পারছিল। বুঝতে পারছিল, সত্যবানস্যারের একটা ভয়ানক অসুখ হয়েছে। এ-অসুখ কখনও সারে কি না অচ্যুতের জানা নেই।

মঙ্গলবার স্কুলের দিনটা বেশ উত্তেজনার মধ্যে কাটল। কারণ, পরদিনই ওরা সৌরভের তোলা ফটো দেখতে পাবে।

অচ্যুত টিফিনের সময় সৌরভকে বলল, 'তুই ফটোর দোকানে বলবি, ওগুলো আমাদের স্কুলের একটা নাটকের রিহার্সালের ফটো—এমার্জেন্সি প্রিন্ট দরকার।'

প্রতীক বলল, 'স্যাটাস্যাটকে যদি চিনে ফ্যালে?'

বাসব বলল, 'তোদের কাছে যা শুনলাম তাতে মনে হয় স্যাটাস্যাটের মুখ ভালো করে দেখা যাবে না।'

কুলদীপ চোখ পাকিয়ে বলল, 'চিনতে পারল তো বয়েই গেল—।' তারপর বাসবের টিফিন বক্স থেকে আধখানা সন্দেশ নিয়ে মুখে পুরে দিল।

সৌরভ বলল, 'ফটোর প্রিন্ট হাতে এলে অমিয়স্যারকে ব্যাপারটা জানালে কেমন হয়?'

অচ্যুত বলল, 'জানালে অমিয়স্যার হয়তো হেডস্যারকে জানাতে বলবেন। হেড়ুর সঙ্গে দেখা করতে আমার ভয় করে।'

কুলদীপ বলল, 'ভয়ের কী আছে! স্যাটাস্যাটের ফটো নিয়ে আমি তোর সঙ্গে হেড়ুর কাছে যাব।'

'ঠিক আছে প্রিন্টটা আগে হাতে আসুক...।'

ওদের আলোচনা-পরিকল্পনার যেন কোনও শেষ নেই। স্কুলে যে-কথা শেষ হয় না সেগুলো রাতে টেলিফোনে চলতে থাকে।

অচ্যুত যে ইদানীং ফোন বড্ড বেশি করছে সেটা ওর মায়ের নজরে পড়ল। এমনিতে ওরা খুব দরকার ছাড়া ফোন ব্যবহার করে না। কারণ, অচ্যুতের বাপিকে বেশ কষ্ট করেই ফোনের খরচ চালাতে হয়। তাই বাড়াবাড়িরকম ফোন করা নিয়ে মা অচ্যুতকে বারদুয়েক বকাবকি করল।

'মা যদি জানত কেন এত ফোন করতে হয়, তা হলে ভয়ে কেঁপে উঠত।' মনে-মনে ভাবল অচ্যুত।

বুধবার সকালে ও ফোন করে রাজীবের খবর নিল। রাজীব এখন পুরোপুরি সেরে উঠেছে। তবে মনের জোর ততটা ফিরে পায়নি।

সেদিন সন্ধেবেলা সত্যবানস্যারের কোচিং-এ সময়টা বেশ সহজ-স্বাভাবিকভাবেই কেটে গেল। স্যারকে দেখে কে বলবে, গত পরশু রাতে এই কোচিং-ঘরের দেওয়ালে তিনি বুকে হেঁটে বেরিয়েছেন!

স্যার দু-তিনবার রাজীবের কথা জিগ্যেস করলেন। তারপর আচমকা মাথাটা পিছনদিকে হেলিয়ে বুকে কয়েকবার হাত বোলালেন।

কোচিং-এর শেষে বাড়ি ফেরার সময় ওরা সৌরভের সঙ্গে ফটোর দোকানে গেল। ফটোগুলো ডেলিভারি নিয়ে ওরা একটু দূরে সরে গেল।

ধীরে-ধীরে খাম থেকে প্রিন্টগুলো বের করল সৌরভ।

ওরা সবাই হাঁ করে সত্যবানস্যারের ছবিগুলো গিলতে লাগল।

অচ্যুত একটা প্রিন্ট নিজের কাছে রেখে দিল। মউলিকে ঘটনাগুলো যখন বলবে তখন ছবিটা দেখাবে।

কুলদীপ বলল, 'আমি বাসবকে একটা ফটো দেখিয়ে দেব।'

প্রতীক বলল, 'তোরা যদি বলিস, তা হলে রাজীবকেও দেখাব।'

অচ্যুত বলল, 'না, না—রাজীবকে এক্ষুনি দেখানোর দরকার নেই। ও আগে সেরে উঠুক, রেগুলার স্কুলে আসুক—তখন দেখানো যাবে।'

তারপর ওরা যার-যার বাড়ির দিকে রওনা হল।

রাজীবের কথা ভাবতে-ভাবতে অচ্যুত বাড়ি ফেরামাত্রই মা বলল, 'একটু আগেই রাজীবের মা ফোন করেছিলেন। জানতে চাইছিলেন, রাজীব আমাদের বাড়িতে এসেছে কি না।'

'তার মানে!' চমকে উঠল অচ্যুত।

সঙ্গে-সঙ্গে ও রাজীবের বাড়িতে ফোন করল।

'হ্যালো, আন্টি, আমি অচ্যুত বলছি।'

'দ্যাখো না, রাজু আধঘণ্টা মতন আগে কাউকে না বলে কোথায় বেরিয়ে গেছে। আমি ওর ফোনবুক দেখে পসিব্‌ল সব জায়গায় ফোন করলাম। বাট নোবডি নোজ হোয়্যার হি ইজ। রাজু এখনও ভালো করে সেরে ওঠেনি—শরীর এখনও উইক...আমি যে এখন কী করি! ওর বাপি গতকাল ভাইজাগ গেছে—ফ্রাইডেতে ফিরবে...।' রাজীবের মাম্মির আত্মবিশ্বাসে চিড় ধরে গেছে। ওঁর গলা বেশ অসহায় শোনাচ্ছে।

'আচ্ছা, আজ সন্ধের পর রাজীবের কি কোনও ফোন এসেছিল?'

অচ্যুতের বুকের ভেতরে গুমগুম শব্দ শুরু হয়ে গেল। ও উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল।

'হ্যাঁ...কে একজন ফোন করেছিলেন। বলছিলেন, রাজুর স্যার...।'

'ক'টার সময় ফোনটা এসেছিল?'

'অ্যাবাউট এইট থারটি...।'

অচ্যুতদের কোচিং শেষ হয়েছে আটটা নাগাদ। তা হলে তার পরে সত্যবানস্যার রাজীবকে ফোন করে থাকতে পারেন।

রবিবার রাজীবের সঙ্গে অচ্যুতের ফোনে কথা হয়েছিল। রাজীব তখন কান্নাকাটি করছিল। বলছিল, স্যাটাস্যাট ওকে অদ্ভুত গলায় ডাকছিল। ঠিক যেন নেশা ধরানো ঘুমপাড়ানি গান। অনেকটা নিশির ডাকের মতো।

সেদিনটা ছিল শনিবার।

তা হলে আজও কি সেইরকম কিছু হয়েছে? রাজীবের মাম্মি আজ আর ছেলেকে আটকাতে পারেননি।

'কী হল?' রাজীবের মাম্মি ওপাশ থেকে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কিছু বলছ না কেন?'

অচ্যুত ঠোঁট কামড়াল। একপলক তাকিয়ে রইল ফাঁকা দেওয়ালের দিকে। তারপর বলল, 'আপনি চিন্তা করবেন না। আমি খোঁজ করে দেখছি। কোনও খবর পেলে আপনাকে ফোন করে জানিয়ে দেব।'

'তুমি একটু সিরিয়াসলি দ্যাখো, অচ্যুত। আমি ভীষণ উয়ারিড হয়ে আছি।'

ওঁকে আবার আশ্বাস দিয়ে রিসিভার নামিয়ে রাখল অচ্যুত।

ওর মন বলল, সত্যবানস্যারের কোচিং-ঘরে গিয়ে একবার খোঁজ করা দরকার।

ও চটপট কুলদীপ, প্রতীক আর সৌরভকে ফোন করল।

প্রতীককে বাড়িতে পাওয়া গেল না। বাকি দুজনকে ও তৈরি হয়ে সত্যবানস্যারের কোচিং-এ আসতে বলল।

তারপর শোওয়ার ঘরে গিয়ে বাপির বালিশের পাশ থেকে তিন ব্যাটারির টর্চটা তুলে নিল। একবার 'অন' করে দেখে নিল ঠিকঠাক জ্বলছে কি না।

টর্চ হাতে নিয়ে বেরোনোর সময় রান্নাঘরের দিকে গলা বাড়িয়ে বলল

'মা, আমি একটু কুলদীপের বাড়ি যাচ্ছি। তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। তুমি দরজাটা দিয়ে দাও।'

মা তাড়াতাড়ি খুন্তি-কড়াই সামলে রান্নাঘর থেকে বেরোতে-বেরোতে অচ্যুত সাইকেল টেনে নিয়ে রাস্তায় চলে এসেছে।

মা সদর দরজার কাছে যখন এল তখন অচ্যুতের সাইকেল অনেকটা দূরে চলে গেছে। মায়ের পিছুডাক ও শুনতে পেল না। দরজা বন্ধ করতে-করতে মা ভাবল, অচ্যুতের বাবার কী যে এক তাসের নেশা! সে বাড়িতে থাকলে যা-হোক করে ছেলেটাকে হয়তো আটকাতে পারত। এই বয়েসটা যে ভালো নয়, সেটা মানুষটা বুঝলে আর চিন্তা ছিল না। ছেলেটা এমন তাড়াহুড়ো করে কুলদীপের বাড়ি গেল কেন, কে জানে!

মায়ের জন্য অচ্যুতের খারাপ লাগছিল। কিন্তু আরও খারাপ লাগছিল রাজীবের জন্য।

জোরে প্যাডেল করে দশমিনিটের মধ্যেই ও সত্যব্যানস্যারের কোচিং-এ পৌঁছে গেল। দেখল, কুলদীপ আর সৌরভ তখনও এসে পৌঁছয়নি।

বাড়িটার কাছ থেকে একটু দূরে সাইকেল থামিয়ে দিল অচ্যুত। অবাক হয়ে দেখল, কোচিং-ঘরের জানলাগুলো খোলা, কিন্তু কোনও জানলাতেই আলো চোখে পড়ছে না।

আলো নেভানো অথচ জানলা খোলা কেন?

সাইকেল থেকে নেমে পা টিপে-টিপে কোচিং-এর দরজার দিকে এগোল অচ্যুত। ডানহাতের শক্ত মুঠোয় টর্চটা ধরা রয়েছে।

রাত সবে ন'টা পেরিয়েছে, কিন্তু এই অঞ্চলটা এমন যেন ঘড়ির কাঁটা তিন ঘণ্টা এগিয়ে গেছে। চারপাশে অন্ধকার গাছপালার মাঝে একতলা বেখাপ্পা বাড়িটাকে আরও অন্ধকার বলে মনে হচ্ছিল।

কোচিং-এর দরজার কাছে পৌঁছে অচ্যুত একটা হাসির শব্দ শুনতে পেল।

এ-হাসি ওর চেনা। মিহি খিলখিল হাসি।

যতটা ভয় পাওয়ার কথা অচ্যুত ততটা ভয় পেল না। কারণ, সত্যবানস্যার নিজেই পরশুদিন বলেছেন, 'তোর কোনও ক্ষতি হোক আমি চাই না...।'

স্যার নিশ্চয়ই অচ্যুতের কোনও ক্ষতি করবেন না।



...সেদিকে তাক করে অচ্যুত টর্চ জ্বালল এবং দৃশ্যটা ওকে পাথর করে দিল।

কৌতূহল ওকে টানতে লাগল। ঘরের ভেতর থেকে হাসির আওয়াজ আসছে কেন? কুলদীপ, সৌরভ যখন আসে আসুক—ওর একবার দেখতে ইচ্ছে করছে ঘরের ভেতরের রহস্যটা কী।

দরজায় আলতো করে চাপ দিল অচ্যুত। দরজা ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দে খুলে গেল।

ভেতরটা গাঢ় অন্ধকার। তারই মধ্যে জ্বলছে দুটো সবুজ চোখ। বোধহয় দরজার শব্দ পেয়েই এদিকে তাকিয়েছে।

সেদিকে তাক করে অচ্যুত টর্চ জ্বালল। এবং দৃশ্যটা ওকে পাথর করে দিল।

রাজীব উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে। ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ওর ওপরে হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে রয়েছেন সত্যবানস্যার। স্যারের দাঁতের সারি চকচক করছে। ঠোঁটজোড়া টুকটুকে লাল। তার আশেপাশে কয়েক জায়গায় লিপস্টিকের মতো লালচে ছোপ। সবুজ চোখ দুটো তীব্রভাবে অচ্যুতের দিকে তাকিয়ে।

স্যার তখনও খিলখিল করে হাসছেন।

অচ্যুত বুকফাটা চিৎকার করে উঠল। আর সঙ্গে-সঙ্গে ঝুঁকে পড়া নেকড়েটা সোজা হয়ে দাঁড়াল। এবং অচ্যুতকে তাক করে লাফিয়ে পড়ার জন্য সামান্য কুঁজো হল।

অচ্যুত পাগলের মতো ছুট লাগল। ওর হাতের টর্চ কোথায় যেন ছিটকে পড়ল। টর্চের আলোর বৃত্তটা পুরোনো বাড়ির দেওয়ালের গায়ে এপাশ-ওপাশ দুলে আগাছার জঙ্গলে কোথায় হারিয়ে গেল।

ভয়ঙ্কর মৃত্যু তেড়ে এলে মানুষ যেভাবে মরিয়া হয়ে পালিয়ে বাঁচতে চায়, ঠিক সেভাবে দৌড়ল অচ্যুত। হাঁকপাঁক করে পৌঁছে গেল সাইকেলের কাছে। সাইকেল টানতে-টানতেই একলাফে তাতে চড়ে বসল। তারপর শুরু হল একা-একা সাইকেল রেস।

তারই মধ্যে পিছন তাকিয়ে দেখল সত্যবানস্যার আর-একটা সাইকেলে চড়ে ছুটে আসছেন। অঙ্কে চ্যাম্পিয়ান হয়েও আজ আর অচ্যুতের রক্ষা নেই।

প্যাডেল করতে-করতে ভয়ে কান্না পেয়ে গেল অচ্যুতের। মায়ের পিছুডাকটা না শুনে ও আজ মারাত্মক ভুল করেছে। পোষা সাইকেলটাকে

ও মনে-মনে বলতে লাগল, 'আজ আমাকে বাঁচাতেই হবে। নইলে আমাদের এতদিনের বন্ধুত্ব মিথ্যে। ছোট—ছোট...আরও জোরে ছোট...।'

রাস্তার দু-চারজন লোক অচ্যুতের ছুটন্ত সাইকেল দেখে ভাবল, এক্ষুনি ছেলেটা অ্যাক্সিডেন্ট করবে। কয়েকটা সাইকেল রিকশা চটপট পাশে সরে গিয়ে ওর বেপরোয়া গতির সাইকেলকে পথ করে দিল।

বাড়ির কাছে পৌঁছে সাইকেলে ব্রেক কষল অচ্যুত। একলাফে সাইকেল থেকে নেমে সাইকেলটা ঠেলে ফেলে দিল একপাশে। তারপর দুমদুম করে দরজায় ধাক্কা দিল আর একইসঙ্গে চেঁচিয়ে ডাকল, 'মা! মা! দরজা খোলো—জলদি।'

বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে অচ্যুত উসখুস করতে লাগল। গলা উঁচু করে দেখল, সত্যবানস্যার তীরবেগে সাইকেল চালিয়ে ছুটে আসছেন। ওঁর সবুজ চোখ এখন স্বাভাবিক হয়ে গেছে।

দরজা তখনও খুলছে না দেখে একলাফে মউলিদের দরজায় চলে গেল অচ্যুত। ঠেলা মারতেই দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকে ঝটপট দরজায় খিল তুলে দিল। তারপর দরজায় পিঠ দিয়ে হাপরের মতো হাঁফাতে লাগল।

॥ আট ॥

দরজা বন্ধ করার সময় দড়াম করে শব্দ হয়েছিল। খিল দেওয়ার সময়েও।

অচ্যুত চোখ বুজে হাঁফাচ্ছিল। আর ভাবছিল, সত্যবানস্যার ওকে মউলিদের বাড়িতে ঢুকতে দেখেছেন কি না। মউলিদের বাড়িতে এর আগে কোনওদিন ও ঢোকেনি।

এমন সময় দরজার কাছটায় একটা জোরালো আলো জ্বলে উঠল।

'এ কী, তুমি! এ সময়ে!'

মউলি।

চোখ খুলল অচ্যুত। কয়েক হাত দূরেই চোখ বড়-বড় করে দাঁড়িয়ে মউলি। পরনে সাদা টপ, নীলচে স্কার্ট, কপালে টিপ, আর জোড়া বিনুনি।

এই বিপদের মুহূর্তে মউলিকে সবচেয়ে বড় বন্ধু বলে মনে হল অচ্যুতের। ও হাঁফাতে-হাঁফাতে বলল, 'শিগগির ওপরে চলো—।'

'কেন, কী হয়েছে?'

'পরে বলব। আগে চলো, দোতলা থেকে উঁকি মেরে একটা জিনিস দেখতে হবে।'

অচ্যুতের মুখ-চোখ দেখে মউলি আর কথা বাড়াল না। ওকে নিয়ে ওপরে উঠল। উঠতে-উঠতে বলল, 'তুমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছ...।'

অচ্যুত কোনও জবাব দিল না।

দোতলায় উঠে মউলির মা-কে দেখতে পেল ও। মউলি মায়ের কাছে গিয়ে চাপা গলায় কী যেন বলল। তারপর অচ্যুতের দিকে তাকিয়ে, 'এসো।'

একটা ঘরে ঢুকল ওরা। ঘরের লাগোয়া বারান্দা। সেখানে দাঁড়ালে রাস্তা দেখা যায়। গত বৃহস্পতিবার রাতে মউলি এই বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিল।

অচ্যুত চাপা গলায় মউলিকে বলল, 'সাবধানে উঁকি মেরে দ্যাখো তো, আমাদের বাড়ির দরজায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না...।'

ওকে বিছানার ওপরে বসতে বলে মউলি বারান্দায় গেল।

অচ্যুত ঘরটা চোখ বুলিয়ে দেখল।

দেওয়ালে তিনটে রঙিন পোস্টার। এক কোণে পড়ার টেবিল—বই-খাতায় ভরতি। তার পাশে বইয়ের র‍্যাক। র‍্যাকের পাশে দড়িতে মউলির জামাকাপড় ঝুলছে।

অচ্যুত তাড়াতাড়ি চোখ সরিয়ে নিল। বুঝল, ও মউলির ঘরে বসে আছে।

পড়ার টেবিলের পাশে মেঝেতে একটা জলের জগ ছিল। অচ্যুতের বুকটা কেমন শুকিয়ে গিয়েছিল। জগটা দেখে তেষ্টাটা দ্বিগুণ হয়ে গেল। ও উঠে গিয়ে জগ থেকে ঢকঢক করে জল খেল।

জগটা নামিয়ে রেখে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াতেই দেখল মউলি বারান্দা থেকে ঘরে ঢুকছে।

অচ্যুতের কাছে এসে মউলি বলল, 'একজন ফরসা রোগামতন লোক তোমাদের দরজায় সাইকেল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তোমার মায়ের সঙ্গে কীসব কথা বলছে। আর রাস্তায় পড়ে থাকা একটা সাইকেল দেখিয়ে এপাশ-ওপাশ তাকাচ্ছে—যেন কাউকে খুঁজছে।'

'লোকটার চোখে চশমা আছে?'

'হ্যাঁ—।'

'রাস্তায় যে-সাইকেলটা পড়ে আছে, ওটা আমার—।'

মউলি অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'লোকটা কে?'

'আমাদের স্কুলের অঙ্কস্যার। ওরা তাড়া খেয়েই তো আমি তোমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছি। মা দরজা খুলতে দেরি করছিল...।'

মউলির মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। ও হাঁ করে অচ্যুতের দিকে তাকিয়ে রইল।

অচ্যুত মউলিকে দেখছিল। ডিয়োডোর‍্যান্টের হালকা গন্ধ কোথা থেকে যেন ভেসে আসছিল।

একটু পরে ও মউলিকে বলল, 'দ্যাখো তো, লোকটা চলে গেছে কি না।'

মউলি আবার বারান্দায় গেল।

মিনিটপাঁচেক পর ও ফিরে এল, বলল, 'চলে গেছে। তবে কাকিমা এখনও দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন।'

'আমি তা হলে এখন যাই। মা নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছে।'

'তুমি আমাদের বাড়িতে আজ প্রথম এলে। চা-টা কিছুই...।'

'এটা আবার আসা না কি।' হেসে বলল অচ্যুত, 'এটা তো একটা অ্যাক্সিডেন্ট।'

'অ্যাক্সিডেন্ট?' তারপর নীচু গলায় সেই পুরোনো কথাটাই বলল মউলি, 'মাঝে-মাঝে এরকম অ্যাক্সিডেন্ট হলে বেশ হয়...।'

'আজ আসি। তুমি আমাদের বাড়িতে একদিন এসো।'

অচ্যুত চলে যাচ্ছিল। মউলি ওকে পিছন থেকে জিগ্যেস করল, 'তোমাদের ওই অঙ্কস্যার তোমাকে তাড়া করছিল কেন বললে না তো? অঙ্ক পারোনি?'

পিছন ফিরে তাকাল অচ্যুত, হাসল : 'হ্যাঁ, খুব কমপ্লিকেটেড অঙ্ক। পরে সব বলব। অনেক সময় লাগবে।'

অনেকটা জেদি ভঙ্গিতে মউলি অচ্যুতের কাছে এগিয়ে এল। খপ করে ওর হাত চেপে ধরল। তারপর বেশ চাপা গলায় বলল, 'তুমি খুব ভয় পেয়ে গেছ। সেদিন রাতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলাম...দেখলাম, তুমি সাইকেল নিয়ে কোথায় বেরোলে...বেশ রাত করে ফিরলে। তারপর...তারপর...আজকে এইরকম...কী হয়েছে, অচ্যুত?'

অচ্যুত অবাক হয়ে মউলির মুখের দিকে তাকাল। ওর মুখে নিজের নামটা এই প্রথম শুনল...শুনে খারাপ লাগল না। সত্যি, এই মুহূর্তে মউলিকে সব বলতে পারলে খুব ভালো লাগত। ওর চোখে কী সাংঘাতিক আত্মবিশ্বাসের ছাপ! কী আশ্বাসে ভরা ওর দৃষ্টি!

অচ্যুত দোটানায় দুলছিল। মউলিকে সবকিছু খুলে বলবে? এখনই?

'আমাকে তুমি সব বলবে না?' মউলির গলায় একইসঙ্গে শাসন আর অভিমানের ছোঁওয়া।

'বলব। সত্যি বলছি, বলব। আজ নয়। এখন অনেক রাত হয়ে গেছে। মা চিন্তা করছে।...আসি।' বলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল অচ্যুত।

তরতর করে সিঁড়ি নামার সময় চেঁচিয়ে বলল, 'কাকিমা, আমি যাচ্ছি—।'

ওর মনে হল, মউলির ডিয়োডোর‍্যান্টের গন্ধটা ওর সঙ্গে যেন সদর দরজা পর্যন্ত এল।

দরজা খুলে বাইরে বেরোতেই বলতে গেলে মায়ের মুখোমুখি।

অচ্যুতকে দেখামাত্রই মায়ের চোখে জল এসে গেল। অভিমানভরা চোখে ছেলের দিকে তাকিয়ে মা বলল, 'কোথায় ছিলি তুই? আমি...।' আর বলতে পারল না...গলা ভেঙে গেল।

'ভেতরে চলো, সব বলছি—।'

সাইকেলটা রাস্তা থেকে তুলে নিয়ে মায়ের সঙ্গে বাড়ির ভেতরে ঢুকল অচ্যুত। রাজীবের কথা ভেবে ও শিউরে উঠল।

রাজীব বোধহয় আর...।

রাজীবের কথাগুলো ওর মনে পড়ল, 'তোরা শেষ পর্যন্ত আমাকে ধরে রাখতে পারবি তো?'

ঘরে এসে হাত-মুখ ধুয়ে গুছিয়ে বসতে-না-বসতেই মা আর বাপি এসে হাজির।

মা বলল, 'তলে-তলে তুই কী করছিস বল তো? আজ তোকে সব খুলে বলতেই হবে।'

বাপি কাচুমাচু মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিশ্চয়ই ও-ঘরে বসে টিভি দেখছিল, মা জেদ করে ডেকে এনেছে। ছেলেকে শাসন করে না বলে দু-চারকথা হয়তো বাপিকে শুনিয়েও দিয়েছে।

আমতা-আমতা করে বাপি বলল, 'শেষকালে আবার কী-না-কী বিপদে পড়বি...।'

অচ্যুত হাত নেড়ে বলল, 'সব বলছি। শুধু তার আগে রাজীবের বাড়িতে একটা ফোন করতে দাও—।'

অচ্যুতের কথায় কী যেন ছিল, মা-বাপি ওকে বাধা দিল না। ও রাজীবের বাড়িতে ফোন করে বলল, 'অঙ্কস্যারের কোচিং-এ গিয়ে রাজীব বিপদে পড়েছে।'

রাজীবের মাম্মি খবরটা শুনেই কান্নাকাটি শুরু করে দিলেন। অচ্যুতকে হাজারটা প্রশ্ন করতে লাগলেন।

অচ্যুত দিশেহারাভাবে বলল, 'আন্টি, আমি এর বেশি কিচ্ছু জানি না। আপনি শিগগিরই পুলিশে খবর দিন! দেরি করবেন না...এক্ষুনি...কে জানে, এখনও হয়তো সময় আছে!'

ফোন নামিয়ে রেখে কিছুক্ষণ হাঁফ ছাড়ল অচ্যুত। লক্ষ করল, মা-বাপি ওর দিকে এমন করে তাকিয়ে আছে যেন ও ভিনগ্রহের প্রাণী।

একটু পরে আবার রিসিভার তুলল ও। একে-একে প্রতীক, সৌরভ আর কুলদীপকে খবর দিতে চাইল। সৌরভ আর কুলদীপকে বাড়িতে পেল না—তবে প্রতীক বাড়িতে ছিল। ওকে সংক্ষেপে রাজীবের বিপদের কথা জানাল অচ্যুত। বলল, 'কাল স্কুলে জরুরি মিটিং করতে হবে।'

ফোনের পালা শেষ হলে ও মা-কে বলল, 'খুব খিদে পেয়েছে। খেতে দাও। খেতে-খেতে ব্যাপারটা বলছি...।'

মা আর বাপি অবাক হয়ে অচ্যুতের কাছে গোটা গল্পটা শুনল।

শুনে মায়ের মুখ ভয়ে বদলে গেল।

বাপি বলল, 'হাতে পায়ে ফেভিকল লাগিয়ে তোর অঙ্কস্যার দেওয়ালে হেঁটে বেড়ায়নি তো! টিভিতে ফেভিকলের যেরকম বিজ্ঞাপন দেখায়!'

এত সমস্যার মধ্যেও অচ্যুত হেসে ফেলল। বলল, 'না, একেবারে জেনুইন ম্যাজিক।'

তারপর ফটোগ্রাফটা বের করে মা আর বাপিকে দেখাল।

বাপিকে তার জায়গা থেকে নড়ানো মুশকিল। কারণ, ফটোটা অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখার পর বাপি বলল, 'তুই ঠিক জানিস, তোদের স্যারের ব্লাড ব্যাঙ্ক টাইপের কোনও সাইড বিজনেস নেই!'

অচ্যুত মাথা নেড়ে 'না' বলল।

'এখন কী করবি?' মা ভয়-পাওয়া গলায় জিগ্যেস করল।

'এই টাইপের ব্লাডসাকারদের আগুন ছাড়া খতম করা যায় না...।' বিড়বিড় করে বলল বাপি।

মা বলল, 'কাল থেকে তুই স্কুলে যাস না—।'

'কখ্‌খনও না!' রুখে দাঁড়াল অচ্যুত : 'এইজন্যেই তোমাদের কিছু বলতে নেই! ভুলে যেয়ো না, স্যার একা, আর আমরা অনেক! কাল স্কুলে গিয়ে ব্যাপারটা অন্য স্যারদেরও জানাব। রাজীবের যদি কিছু হয়...।'

রাত বারোটার পর কুলদীপ অচ্যুতকে ফোন করে খবর দিল, রাজীব মারা গেছে।

অচ্যুত ভেবেছিল, এইবার বুঝি সত্যবানস্যারকে নিয়ে পুলিশ টানাটানি করবে, হাজাররকম জিজ্ঞাসাবাদ করবে। কিন্তু তার কিছুই হল না।

কারণ, রাজীবের মৃতদেহ পাওয়া গেল স্যারের কোচিং থেকে অন্তত বিশ হাত দূরে আগাছার ঝোপের ভেতরে। ফলে পুলিশের কাছে সমস্যাটা ধানকলের মাঠের জোড়া খুনের মতোই দাঁড়াল।

এলাকায় খবরটা খুব তাড়াতাড়ি চাউর হয়ে গিয়েছিল। স্কুলে গিয়ে অচ্যুত শুনল ক্লাস হবে না। রাজীবের জন্য শোকপালন করে স্কুল ছুটি দিয়ে দেওয়া হবে।

শোকসভায় দাঁড়িয়ে রাজীবের জন্য নীরবতা পালন করার সময় অচ্যুতের চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এল। একইসঙ্গে ভীণে রাগ হল ওর। ওরা এতজন বন্ধু মিলে শেষ পর্যন্ত রাজীবকে ধরে রাখতে পারল না!

শোকপালন শেষ হলে অচ্যুত, কুলদীপ, বাসবরা জোট পাকাল।

অচ্যুত গতকালের ঘটনাটা ওদের খুলে বলল।

কুলদীপ জিগ্যেস করল, 'রাজীবের বডিটা কোচিং-এর বাইরে গেল কী করে?'

'হয়তো স্যারই ওটা বাইরে আগাছার ঝোপের মধ্যে ফেলে এসেছেন।'

কুলদীপ শিস দিয়ে উঠল।

বাসব অচ্যুতকে বলল, 'এইবার পুলিশ তোকে হ্যারাস করবে।'

'সে করে করুক—যা সত্যি তাই বলব।'

'আমার মনে হয়, ব্যাপারটা এবার স্যারদের জানানো উচিত।'

প্রতীক আর সৌরভও বাসবের কথায় সায় দিল।

অনেক তর্কবিতর্কের পর ঠিক হল ওরা অমিয়স্যারকে পুরো ব্যাপারটা জানাবে।

স্কুলের ভিড় ফিকে হয়ে এসেছিল। স্যাররাও অনেকে বাড়ি চলে যাচ্ছেন। হঠাৎই বাসবের নজরে পড়ল, একতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে

অমিয়স্যার দুজন ছাত্রের সঙ্গে কথা ব ছেন।

বাসব বলল, 'চল, এখনই যাই—স্যারকে গিয়ে বলি।'

অচ্যুত আর প্রতীক ইতস্তত করছিল। কিন্তু কুলদীপও যেন খেপে গেল ঃ 'আর দেরি করলে হবে না, অচ্যুত। রাজীব গেছে, এরপর কার পালা কে জানে! যা করার এখনই করতে হবে। চল—।'

ওরা পাঁচজন অমিয়স্যারের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

স্যার ওদের দিকে একবার জিজ্ঞাসার চোখে তাকিয়ে অন্য দুজন ছাত্রকে ছেড়ে দিলেন।

'কী ব্যাপার রে! রাজীবের জন্যে দুঃখ হয়। কী অরুন্তুদ ঘটনা বল তো!' হাতের একটা ভঙ্গি করে মাথায় চুল ঠিক করলেন অমিয়স্যার।

'স্যার, রাজীবের ব্যাপারেই কয়েকটা কথা আমরা আপনাকে বলতে চাই।' মনিটর বাসব বলল।

'তার মানে!' অমিয়স্যারের ভুরু কুঁচকে গেল।

'হ্যাঁ, স্যার।' অচ্যুতের দিকে আঙুল তুলে দেখাল বাসব ঃ 'ও আপনাকে সব বলবে। আপনাকে যে-করে-হোক একটা ব্যবস্থা করতেই হবে। নইলে আমাদের স্কুল ছারখার হয়ে যাবে।'

'বলিস কী রে! আমাদের স্কুল অবনমিত হয়ে যাবে!'

'হ্যাঁ, স্যার—ভীষণ বিপদে পড়ে আপনাকে এসব কথা বলছি। প্লিজ, ওই জামগাছটার তলায় চলুন।' অচ্যুত অনুনয় করে বলল।

অমিয়স্যার বেশ হকচকিয়ে গেলেন। কিন্তু পাঁচটা নিষ্পাপ মুখের আকাঙ্ক্ষায় তিনি জল ঢেলে দিতে পারলেন না। আলতো করে বললেন, 'চল...।'

আকাশ ঘোলাটে। বৃষ্টি হবে কি হবে না বোঝা যাচ্ছে না। কোথা থেকে যেন বুলবুলির ডাক ভেসে আসছিল। একটু দূরে ইলেকট্রিকের তারে একটা বাঁশপাতি পাখি পোকার আশায় বসে আছে। দুটো ছোট মাপের হলদে প্রজাপতি স্কুলের মাঠের ওপর দিয়ে এলোমেলোভাবে উড়ে যাচ্ছে।

অচ্যুত ভাবছিল, প্রকৃতি আমাদের সুখ-দুঃখের কোনও খবর রাখে না। তাই এরকম বিপদের সময়েও উদাসীন হয়ে সেজেগুজে বসে আছে।

ভিজে স্যাঁতসেতে ঘাসের ওপরে পা ফেলে ওরা সবাই জামগাছতলার

বেদির কাছে গেল। স্যারকে বসিয়ে শুরু করল ওদের রোমাঞ্চকর কাহিনি।

মনোযোগী ছাত্রের মতো অমিয়স্যার গোটা গল্পটা শুনলেন। তারপর 'হুম' শব্দ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

'সবাই বলবে, এ তোদের খপুষ্প কল্পনা। কোনও প্রমাণ কি তোদের কাছে আছে?'

এ-কথা বলামাত্রই তিনটে হাত ছিটকে এল অমিয়স্যারের চোখের সামনে। তিনটে হাতে ধরা রয়েছে তিনটে রঙিন ফটোগ্রাফ। সত্যবানস্যার দেওয়ালে হেঁটে বেড়াচ্ছেন।

অমিয়স্যার অনেকক্ষণ কোনও কথা বলতে পারলেন না। তারপর ধীরে-ধীরে উচ্চারণ করলেন, 'তোরা আজকালকার ছেলে—ভূত-প্রেত-পিশাচে তোদের তেমন বিশ্বাস নেই। এখন বুঝতে পারছিস তো, বিজ্ঞানটাই সব নয়, যুক্তি-প্রযুক্তিই সব নয়! তার বাইরেও একটা রহস্যময় অন্ধকার জগৎ আছে। তোদের কাছে যা শুনলাম তাতে...।' কিছুক্ষণ যেন চিন্তা করলেন অমিয়স্যার। তারপর ঃ 'মনে হয়...একমাত্র বীতিহোত্র ছাড়া এ-পিশাচকে ধ্বংস করা সম্ভব নয়।'

'বীতিহোত্র! সেটা কি কোনও ফলের বীজ বা গাছের শিকড়?' ভাবল অচ্যুত।

কুলদীপ জিগ্যেস করল, 'বীতিহোত্র কী, স্যার...কোনও মন্ত্র?'

অমিয়স্যার মোলায়েম হেসে কুলদীপের দিকে তাকালেন ঃ 'ওঃ, বীতিহোত্র জানিস না! বীতিহোত্র মানে আগুন।'

ওরা পাঁচজন লম্বা করে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল। বাব্বাঃ, স্যার পারেনও বটে!

অচ্যুত বলল, 'স্যার, আমার বাপিও তাই বলছিল...।'

অমিয়স্যার সামান্য ঘাড় দোলালেন। কিছুক্ষণ সময় নিয়ে তারপর বললেন, 'ব্যাপারটা স্কুলকে জড়িয়ে। আমার মনে হয়, ব্যাপারটা আগে পুরকায়স্থবাবুকে জানানো দরকার। তোরা আমার সঙ্গে চল, ওঁকে এখনই গিয়ে এইসব সান্নিপাতিক ঘটনাবলির কথা খুলে বলি।'

ওরা স্যারের সঙ্গে স্কুল-বাড়ির দিকে হাঁটা দিচ্ছিল, দেখল সত্যবানস্যার হাসিমুখে ওদেরই দিকে এগিয়ে আসছেন।

'কীরে, তোরা সব কোথায় চললি? এখনও বাড়ি যাসনি? যা-যা, বাড়িতে গিয়ে পড়াশোনা কর।'

এত স্বাভাবিক কথা বলার ঢং, এত সহজ পা ফেলার ভঙ্গি যে, অচ্যুতরা স্তম্ভিত হয়ে গেল।

অমিয়স্যার অপছন্দের চোখে সত্যবানস্যারের দিকে তাকালেন। একটু বোধহয় ভয়ও পেলেন। কারণ, অমিয়স্যারের মোটাসোটা শরীরটা পলকের জন্য কেঁপে উঠল।

অচ্যুত বেপরোয়া ঢঙে এক পা এগিয়ে গেল সত্যবানস্যারের দিকে। বেশ জোরালো গলায় বলল, 'স্যার, শুনেছেন তো, রাজীব মারা গেছে!'

সত্যবানস্যার হাসলেন, 'হ্যাঁ রে, শুনেছি। ভেরি স্যাড। তবে চিন্তার তো কিছু নেই! তোরা তো আছিস!'

কথাটা বলেই সত্যবানস্যার আচমকা ঘুরে চলে গেলেন।

অমিয়স্যার রাগে ফেটে পড়লেন ঃ 'চোরের মায়ের বড় গলা! কী স্পর্ধা! কী আটোপটংকার! চল, এখনই হেডস্যারের কাছে চল!'

স্যারের কথায় ওরা পা বাড়াল।

স্কুল এর মধ্যেই ফাঁকা হয়ে এসেছে। ওরা দেখল, বানজারা নীচের ক্লাসরুমগুলোর দরজা বন্ধ করে তালা লাগাচ্ছে।

সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠতে-উঠতে অমিয়স্যার বললেন, 'পুরকায়স্থবাবুকে ব্যাপারটা ঠিক কীভাবে বলব ভাবছি। উনি বোধহয় বিশ্বাস করতে চাইবেন না। হয়তো বলবেন...।'

'কেন, স্যার, ফটো তো আছে!' বাসব বলল।

'হুঁ, তা আছে। আসলে কী জানিস, আমারই বিশ্বাস হতে চাইছে না। যদিও জানি, তোরা সব সত্যি কথাই বলছিস।'

কথা বলতে-বলতে হেডস্যারের ঘরের দরজায় চলে এল ওরা।

ঘরের বাইরে কালো কাঠের নেমপ্লেট—তার ওপরে সাদা হরফে নাম লেখা ঃ মোহনলাল পুরকায়স্থ, এম. এসসি., এম. এড.।

দরজায় খয়েরি রঙের ভারী পরদা ঝুলছে। পরদার পাশ দিয়ে ভেতরটা দেখা যাচ্ছে না।

অমিয়স্যার একটু উসখুস করতে লাগলেন। বললেন, 'এতজন একসঙ্গে ঢোকার দরকার নেই। উনি হয়তো কিছু মনে করবেন। বাসব আর অচ্যুত আমার সঙ্গে আয়।' হাতের ইশারায় ওদের কাছে ডাকলেন স্যার। প্রতীক, কুলদীপ, আর সৌরভকে লক্ষ করে বললেন, 'তোরা বাইরে প্রতীক্ষমাণ

হয়ে থাক। দরজা ছেড়ে কোথাও যাবি না, বুঝলি...।'

ওরা তিনজন পরদা সরিয়ে হেডস্যারের ঘরে ঢুকে পড়ল।

ছোট্ট ঘর। রং-খসা ড্যাম্প-ধরা দেওয়াল। সিলিং-এ কাঠের কড়িবরগা। শুধু জানলা দরজার পরদাগুলোই যা কোনোরকম আধুনিক।

পুরোনো কাঠের চৌকো টেবিলের ওপারে বসে মোহনলালবাবু কী একটা ফাইল খুলে পড়ছিলেন। আঙুলের ফাঁকে সিগারেট।

'আসতে পারি, স্যার?' দরজার কাছে দাঁড়িয়ে অমিয়স্যার কুণ্ঠিতভাবে জিগ্যেস করলেন।

হেডস্যার মুখ তুলে তাকালেন। হেসে বললেন, 'আসুন, আসুন—বসুন...।'

তারপরই বাসব আর অচ্যুতকে দেখে বললেন, 'আরে তোরা! কী ব্যাপার?'

'ওরা আমার সঙ্গে এসেছে। ক্লাস নাইনের "এ" বিভাগের ছেলে—অচ্যুত আর বাসব।' ওদের পিঠে একে-একে হাত দিয়ে অমিয়স্যার বললেন, 'ইস্কুলের ভয়ংকর বিপদ, স্যার...আপনাকে কিছু একটা করতে হবে। ওরা আপনাকে সব...।'

'কী, রাজীবের ব্যাপারে কিছু?' হেডস্যার সিগারেটে টান দিলেন।

'হ্যাঁ, স্যার।' অচ্যুতের গলা কেঁপে গেল।

'ঝাঁড়ি থেকে বড়বাবু আমাকে ফোন করেছিলেন। আমি বলেছি, আজ কনডোলেন্স-এর ব্যাপার আছে—স্কুল তাড়াতাড়ি ডিজল্‌ভ করে যাবে। কাল দুপুরে ওঁর সঙ্গে কথা বলব।'

অমিয়স্যার বললেন, 'মাত্র পাঁচ-দশমিনিট সময় নেব, স্যার। অচ্যুত, তুই বল—সংক্ষেপে বলবি।'

অচ্যুত ঢোঁক গিলে বলতে শুরু করল। রাজীবের মায়া মাখানো করুণ মুখটা কল্পনা করে ও নিজেকে জেদ আর সাহস জোগাল।

একটানা গল্পটা ও বলে গেল। আগ্রহ আর চাপা কৌতুক নিয়ে মোহনলালবাবু ওর সব কথা মন দিয়ে শুনে গেলেন।

গল্প বলা শেষ হলে পকেট থেকে সত্যবানস্যারের ফটোগ্রাফটা বের করল অচ্যুত। ঘন-ঘন শ্বাস নিয়ে বলল, 'যদি, স্যার, আপনার বিশ্বাস না হয়, স্যার...তা হলে এটা দেখুন...সত্যবানস্যার দেওয়ালে হাঁটছেন...।'

ফটোটা হেডস্যারের দিকে এগিয়ে দিল ও।

অমিয়স্যার বললেন, 'একেবারে অবিশ্বসনীয় ঘটনা, স্যার...।'

'অবিশ্বাসের কী আছে।' টেবিলের অ্যাশট্রেতে সিগারেটের ছাই ঝাড়লেন হেডস্যার। বললেন, 'আপনারা কি আর আমার কাছে এসে মিথ্যে কথা বলবেন।'

'আপনার অবাক লাগছে না?'

'না, অবাক লাগবে কেন। পৃথিবীতে অবিশ্বাস্য কত কী আছে। সেগুলো কি মিথ্যে, বলুন?'

অমিয়স্যার থতমত খেয়ে চুপ করে রইলেন। মোহনলালবাবু নিশ্চয়ই ওঁদের সবাইকে পাগল ভাবছেন। মনস্তত্ত্ববিদ্‌রা যে-ঢঙে কথা বলেন উনি অনেকটা যেন সেই ঢঙে কথা বলছেন।

'দেওয়ালে সত্যবানবাবু ঠিক কেমন করে হাঁটছিল বল তো? এইরকম?'

ওরা অবাক হয়ে দেখল, হেডস্যার সিগারেটটা ঠোঁটে নিলেন। তারপর দু-হাত টান-টান করে পিছনের দেওয়ালের দিকে বাড়িয়ে দিলেন। হাতের পাতা দুটো চুম্বকের মতো দেওয়ালে সেঁটে গেল। তারপর ওঁর গোটা শরীরটা যেন বাতাসে ভেসে দেওয়ালে পৌঁছে গেল।

ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট ধরা অবস্থায় তিনি টিকটিকির মতো দেওয়ালে হাঁটতে লাগলেন। তারপর সিগারেটটা ডানহাতে নিয়ে ঘাড় কাত করে তাকালেন অচ্যুতদের দিকে। খিলখিল করে হেসে বারবার জিগ্যেস করতে লাগলেন, 'দ্যাখ তো, এইরকম?'

অমিয়স্যার চেয়ারে কাত হয়ে পড়লেন। ওঁর মুখ দিয়ে গোঁ-গোঁ শব্দ বেরোতে লাগল।

বাসব অচ্যুতকে ভয়ে জাপটে ধরল। ফটো দেখা আর সামনাসামনি দেখায় অনেক তফাত আছে।

অচ্যুত অবাক হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু ভয় ততটা পায়নি। এই কসরত দেখে-দেখে ওর গা-সওয়া হয়ে গেছে। সত্যবানস্যারের কথাটা ওর মনে পড়ল ঃ '...আমাদের হাত থেকে পালানো যায় না...।' 'আমাদের' মানে তা হলে হেডস্যার আর সত্যবানস্যার! ধানকলের মাঠে কুলদীপের বন্ধুরা নিশ্চয়ই স্যাটাস্যাটের সঙ্গে হেডস্যারকেই দেখেছিল! আর তারপরই জোড়া খুন!



...ওরা অবাক হয়ে দেখল, হেডস্যার সিগারেটটা ঠোঁটে নিলেন। তারপর দু-হাত টান-টান করে পিছনের দেওয়ালের দিকে বাড়িয়ে দিলেন...

অচ্যুত আর ভাবতে পারছিল না।

হেডস্যার তখন দেওয়াল থেকে সিলিং-এ চলে গেছেন। হাতের সিগারেটে টান দিতে-দিতে তিনি শরীরটাকে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো ঝুলিয়ে দিলেন। পায়ের চেটো সিলিং-এ এঁটে আছে, মাথাটা নীচের দিকে।

সেই অবস্থাতেই সিগারেটে টান দিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লেন মোহনলালবাবু। ধোঁয়াটা ওঁর পায়ের দিকে যেতে শুরু করল।

'দ্যাখ তো, এইরকম সবুজ চোখ?'

অচ্যুত দেখল, কখন যেন হেডস্যারের চোখ স্যাটাস্যাটের মতো সবুজ হয়ে গেছে। ও সেই সবুজ চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল। একটা নেশার ঘোর ওকে ধীরে-ধীরে জড়িয়ে ধরছিল।

'আমি আর তোদের অঙ্কস্যার—আমরা অনেক কিছু পারি। আসলে আমরা কিন্তু আলাদা নই, বুঝলি...একই...।' মিহি খিলখিল হাসি। তারপর ঃ 'এ নিয়ে পাঁচকান করে কোনও লাভ নেই, শোরগোল কিংবা থানা পুলিশ করেও কোনও লাভ নেই। এ পর্যন্ত যা-কিছু দেখেছিস, বা এখন যা দেখেছিস, কিংবা এখন যা দেখছিস—সবকিছু ভুলে যাওয়াই ভালো।'

স্রেফ পায়ে হেঁটে সিলিং থেকে দেওয়ালে, এবং দেওয়াল থেকে মেঝেতে নেমে এলেন মোহনলালবাবু। টেবিলে রাখা অ্যাশট্রেতে ছোট-হয়ে-যাওয়া সিগারেটটা গুঁজে দিলেন। তারপর ধীরেসুস্থে চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

অমিয়স্যার তখন থরথর করে কাঁপছেন। বাসব চোখ বুজে অচ্যুতকে জাপটে ধরে রয়েছে। অচ্যুত সোজা হয়ে কাঠের মতো দাঁড়িয়ে—একটুও নড়াচড়া করতে পারছে না।

ওর রাজীবের কথা মনে পড়ছিল, আর উলটোদিকের চেয়ারে বসা টাকমাথা, চশমা পরা লোকটাকে দেখে বমি পাচ্ছিল। ভাবছিল, কীভাবে এই একজোড়া রক্তপিশাচকে খতম করা যায়।

মোহনলালবাবুর চোখ এখন কটা রং থেকে ক্রমে স্বাভাবিক হয়ে আসছে। তিনি হাতছানি দিয়ে অচ্যুতকে কাছে ডাকলেন।

ডাকটা অনেকটা নিশির ডাকের মতন। অচ্যুতের সেরকমই মনে হল।

অতিকষ্টে বাসবের বাঁধন ছাড়িয়ে ও টেবিলের পাশ ঘুরে হেডস্যারের কাছে গেল। বাসব ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করে দিল।

হেডস্যার ছোবল মারার মতো পলকে হাত বাড়িয়ে অচ্যুতের চুলের মুঠি ধরে এক হ্যাঁচকায় ওকে কাছে টেনে নিলেন। ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে এসে দাঁত খিঁচিয়ে হিসহিস করে বললেন, 'তুই-ই যত নষ্টের গোড়া! তোকে ছেড়ে রেখে আমরা ভুল করেছি। তোকে কতকগুলো জরুরি কথা বলার আছে...।' ওকে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে গালে হাত বুলিয়ে আদর করলেন হেডস্যার। আচমকা পালটে গিয়ে স্নেহ আর ভালোবাসার হাসি ফুটিয়ে তুললেন মুখে। থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, 'তুই বড় দুরন্ত আর দুষ্টু। তবে লেখাপড়ায় ফার্স্টক্লাস। দেখবি, সামনের পরীক্ষায় তুই ফার্স্ট হবি—আমরা তোকে ফার্স্ট করাব। কোনও চিন্তা নেই। আজ রাত আটটার সময়ে ধানকলের মাঠে চলে আয় দেখি। আমি আর সত্যবানস্যার থাকব। তোর সঙ্গে আমাদের খুব জরুরি আলোচনা আছে। মনে করে আসবি কিন্তু।' অচ্যুতের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন বারবার : 'অবশ্য না এসে তুই পারবি না...আসতে তোকে হবেই...। আমি জানি তুই আসবি।'

সম্মোহন করার ভঙ্গিতে একদৃষ্টে অচ্যুতের চোখে তাকিয়ে রইলেন হেডস্যার। আর সাপ-খেলানো সুরে বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, 'লক্ষ্মী ছেলে...আসবি কিন্তু...লক্ষ্মী ছেলে...আসবি কিন্তু...আসতে তোকে হবেই...না এসে তুই পারবি না...।'

অচ্যুতের কেমন ঘোরের মতো লাগছিল। ও ঘাড় হেলিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, স্যার, যাব। যাব, যাব, যাব।'

'লক্ষ্মী ছেলে।' হেডস্যার আদরের গলায় বললেন, 'তুই এখন যা। আর শোন, আমি এমন ব্যবস্থা করে দিচ্ছি যে, অমিয়বাবু আর বাসবের এসব কিছুই মনে থাকবে না। তবে তুই কিন্তু কাউকে কোনও কথা বলবি না।'

অচ্যুত টেবিলের কাছ থেকে পায়ে-পায়ে সরে এল।

হেডস্যার এবার অমিয়স্যার আর বাসবের দিকে পালা করে তাকালেন। ওঁর চোখ আবার সবুজ হয়ে গেল। অমিয়স্যার আর বাসব অপলকে হেডস্যারের দিকে তাকিয়ে রইল।

অচ্যুতের মনে হল, কোনও অদৃশ্য রশ্মি যেন হেডস্যারের চোখ থেকে বেরিয়ে অমিয়স্যার আর বাসবের চোখ দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে।

প্রায় একমিনিট পর হেডস্যারের চোখ আবার স্বাভাবিক হল। তিনি বেশ সহজ গলায় অমিয়স্যারকে বললেন, 'ঠিক আছে, অমিয়বাবু...আপনারা তা হলে আসুন। ওই কথাই রইল...।'

অমিয়স্যার ঘাড় নেড়ে চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন। বাসবের হাত ধরে সাবধানে পা ফেলে ঘরের দরজার দিকে এগোলেন। অচ্যুত ওঁদের পাশে-পাশে হেঁটে চলল।

বাসব আর অচ্যুতের দিকে পালা করে তাকিয়ে অমিয়স্যার যান্ত্রিক স্বরে মিনমিন করে বললেন, 'তা হলে ওই কথাই রইল, বুঝলি?'

বাসব ফ্যালফ্যাল করে অমিয়স্যারের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। অচ্যুতের মাথায় কিছুই ঢুকল না।'

ওর মনে শুধু পাগলাঘণ্টি বাজছিল ঃ ধানকলের মাঠ, রাত আটটা...ধানকলের মাঠ, রাত আটটা...ধানকলের মাঠ, রাত...।

ওরা তিনজন হেডস্যারের ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল।

প্রতীক, কুলদীপ আর সৌরভ দেখল যে-তিনজন মানুষ হেডস্যারের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে তাদের মুখ-চোখ দেখে মনে হয় এইমাত্র ওরা সর্বস্বান্ত হয়েছে।

প্রত্যেকেরই চোখে হতভম্ব শূন্য দৃষ্টি। যেন অন্য কোনও গ্রহ থেকে এসে সদ্য পা ফেলেছে পৃথিবীর মাটিতে।

ওদের পাশাপাশি হেঁটে যেতে-যেতে একের পর এক প্রশ্ন করে চলল কুলদীপ।

উত্তরে অচ্যুত অস্পষ্টভাবে বিড়বিড় করে কীসব বলে একরকম দৌড়ে চলে গেল ওর সাইকেলের দিকে।

কুলদীপরা এবার বাসবকে ছেঁকে ধরল। কিন্তু বাসবও কোনও কথা বলতে পারল না। ভয়ে ওর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ও কাঁদতে শুরু করে দিল।

সৌরভ একটু রুক্ষভাবেই অমিয়স্যারকে বলল, 'স্যার, হেডস্যার কী বললেন? সত্যবানস্যারের ব্যাপারে উনি কি কোনও স্টেপ নিচ্ছেন?'

অমিয়স্যার সিঁড়ি নামতে-নামতে খোলা উঠোনের দিকে এমনভাবে তাকালেন যেন চোখ খোলা থাকা সত্ত্বেও তিনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন

না। সেই অবস্থাতেই আলতো করে বললেন, 'ওই কথাই রইল...ওই কথাই রইল।...নীতিহোত্র, নীতিহোত্র...নীতিহোত্র ছাড়া নিস্তার নেই রে...নিস্তার নেই।'

ওদের তিনজনকে বোকার মতো মাঠের ওপরে দাঁড় করিয়ে রেখে অমিয়স্যার চলে গেলেন। বাসবও ওঁর পিছন-পিছন ছুট লাগাল।

কুলদীপরা বুঝল কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। ওরা তিনজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। তারপর একতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে জটলা শুরু করল।

হঠাৎ ওরা দেখল, সত্যবানস্যার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠছেন।

প্রতীক আর সৌরভকে ইশারায় অপেক্ষা করতে বলে কুলদীপ সত্যবানস্যারের পিছু নিল।

দোতলায় এসে সত্যবানস্যার সটান এগিয়ে গেলেন হেডস্যারের ঘরের দিকে। এবং পরদা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

কুলদীপও পা টিপে-টিপে পৌঁছে গেল হেডস্যারের ঘরের কাছে। তারপর ন্যায়-অন্যায় ভুলে গিয়ে দরজার পাশে আড়ি পাতল।

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর ঘরের ভেতরে থেকে রক্ত-হিম করা খিলখিল হাসি শোনা গেল।

হেডস্যার বলছেন, 'ছেলেটাকে আজ রাত আটটায় ধানকলের মাঠে আসতে বলেছি...।'

সত্যবানস্যার বলছেন, 'হ্যাঁ, অচ্যুতটা বড্ড ডিসটার্ব করছে। ভেবেছিলাম ওকে কিছু করব না...কিন্তু ও এমন শুরু করেছে যে, এখান থেকে হয়তো পাততাড়ি গোটাতে হবে।'

হেডস্যার হেসে বললেন, 'তোমার ছবি তুলেছে দেখলাম। তুমি দেওয়ালে হেঁটে বেড়াচ্ছ।'

'তাই! কখন তুলল কে জানে! অবশ্য ও-ছবি দেখিয়ে কোনওরকম সুবিধে করতে পারবে না। যদি পুলিশে গিয়ে জানায় তা হলে পুলিশও কোনও আমল দেবে না...।'

'কিন্তু বারবার যদি ও পুলিশকে বিরক্ত করতে থাকে তা হলে একসময় পুলিশও আমল দেবে। তখন...। প্র্যাকটিক্যালি সেইজন্যেই একটা কড়া

স্টেপ নিতে হল। তুমি সময়মতো গৌরী বস্ত্রালয়ের মোড়ে চলে এসো। দুজনে একসঙ্গে ধানকলের মাঠে যাব।'

'ওঃ...দারুণ হবে। একইসঙ্গে তেষ্টার তৃপ্তি, আর ছেলেটার হাত থেকে নিষ্কৃতি...।'

'তোমার দেখছি জিভে জল এসে গেছে।' খিলখিল করে হাসলেন হেডস্যার।

'আর তোমার আসেনি বুঝি।' সত্যবানস্যারও খিলখিল করে হাসলেন।

দুজনের হাসি যেন আর থামতেই চায় না। দুই পিশাচের রক্ত-হিম-করা হাসি।

কুলদীপ বেড়ালের পায়ে ছুট লাগাল। ঘাম ফুটে বেরোল ওর কপালে। উত্তেজনায় ও চাপা সুরে শিস দিয়ে উঠল।

দুদ্দাঁড় করে একতলায় নেমে এসেই ও সৌরভ আর প্রতীকের হাত ধরে টান মারল। দৌড়ে সাইকেল স্ট্যান্ডের দিকে যেতে-যেতে বলল, 'শিগগিরই আয়...সামনে এখন অনেক কাজ...।'

সাইকেল চালিয়ে নিরাপদ দূরত্বে গিয়ে ওরা মরিয়া হয়ে একটা সমাধান খুঁজতে লাগল।

ভেতরে-ভেতরে ওরা ভয় পাচ্ছিল ঠিকই, কিন্তু আরও ভেতর থেকে কে যেন বলছিল, 'কিছুতেই হার মানা চলবে না! কিছুতেই না!'

অমিয়স্যারের কথাগুলো কুলদীপের মনে পড়ছিল বারবার।

॥ নয় ॥

চাঁদ মেঘে ঢাকা ছিল। হয়তো সেইজন্যই জোনাকির ঝাঁক বাড়াবাড়িরকম উড়ছিল।

অচ্যুত যখন সাইকেল নিয়ে ধানকলের মাঠে পৌঁছল তখন উড়ন্ত আলোর বিন্দুগুলো ওর প্রথম চোখ টানল। একটা ঘোরের মধ্যে থাকলেও ও মুগ্ধ হয়ে জোনাকির খেলা দেখতে লাগল।

আশপাশের অন্ধকারে আরও অন্ধকার গাছপালা চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। বাদলা বাতাস ওদের পাতায় ঝাপটা মারতেই ফিসফাস শুরু হল।

অচ্যুতের মনে হল, ওরা বলেছে, 'অচ্যুত এসে গেছে...অচ্যুত এসে গেছে...।'

ঠিক সেইসময়ে ওর ঠিক পাশ থেকে ফিসফিস করে কে যেন বলে উঠল, 'এসে গেছিস! গুড বয়। সাইকেল রেখে দিয়ে মাঠের মাঝে চল। হেডস্যার ওখানে অপেক্ষা করছেন...।'

অচ্যুত মোটেই চমকে উঠল না। ধীরে-ধীরে পাশ ফিরে তাকাল।

সত্যবানস্যার ওর খুব কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। ওঁর নিশ্বাস অচ্যুতের গায়ে এসে পড়ছে। ঠান্ডা নিশ্বাস। কিন্তু তাতেও অচ্যুত অবাক হল না। ওর মনে এক অদ্ভুত প্রশান্তি।

বিকেলে দু-পশলা বৃষ্টি হয়েছিল। তারপর একটু রোদও দেখা গিয়েছিল—শরতের রোদ। তখন অচ্যুত একটা পুজো-পুজো গন্ধ টের পেয়েছিল।

ওর ভীষণ মন খারাপ লাগছিল। মনের ভেতর থেকে ফিসফিস করে কেউ যেন বলছিল, 'এ-পুজো আর দেখা হবে না।' তাই রোদ উঠতেই ও ছাদে গিয়েছিল বিকেলের শেষ রোদটা গায়ে মাখতে।

'এই যে, মিস্টার অ্যাক্সিডেন্ট!'

মউলি। হলুদরঙের একটা চুড়িদার পরেছে। ঝকঝক করছে। মনে হচ্ছে,

বিকেলের রোদ দিয়ে তৈরি।

অচ্যুত ওর দিকে তাকাল। কোনও কথা বলল না।

'কাল রাতে কী হয়েছিল? অঙ্কস্যারকে দেখে পালিয়েছিলে কেন বলো। তোমার মতো গুডবয়রা কখনও এমন পালায়! তুমি কিন্তু কথা দিয়েছ আমাকে সব বলবে। কখন বলবে বলো।'

অচ্যুতের অনেক কথা বলতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ও কিছুই বলতে পারল না। কয়েকবার ঠোঁট নড়ল শুধু।

মউলি অপেক্ষা করতে লাগল।

অনেকক্ষণ চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত অচ্যুত বিড়বিড় করে বলতে পারল, 'বলব।'

কিন্তু ওর হাবভাব দেখে মউলির ভুরু কুঁচকে গেল। পাঁচিলের কাছে এসে অচ্যুতদের ছাদের দিকে ঝুঁকে পড়ল। তারপর অবাক হয়ে জিগ্যেস করল, 'অ্যাই, তোমার কী হয়েছে বলো তো?'

অচ্যুত সে-প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বলল, 'পুজোয় তুমি নিশ্চয়ই খুব আনন্দ করবে?'

'হ্যাঁ। তুমি করবে না?'

ডুবে যাওয়া সূর্যের দিকে তাকাল অচ্যুত। সেদিকে আঙুল তুলে বলল, 'ওটা কী আনন্দ?'

'কী ব্যাপার! তোমার কী হয়েছে?'

অচ্যুতের চোখে জল এসে গেল। হাতের পিঠ দিয়ে মোছার চেষ্টা করে জড়ানো গলায় বলল, 'কিচ্ছু না। তোমার কথা বলো।'

'হঠাৎ আমার কথা জানতে চাইছ?' চোখ পাকিয়ে হাসল মউলি।

'আজ খুব জানতে ইচ্ছে করছে। পরে যদি আর জানতে না পারি...।'

'ও—। ঠিক আছে, বলছি।' স্বামী বিবেকানন্দের ভঙ্গিতে বুকের কাছে হাত জড়ো করে সোজা হয়ে দাঁড়াল মউলি। তারপর পড়া মুখস্থ বলার ঢঙে বলল, 'আমার নাম মউলি মিত্র। তোমাদের পাশের বাড়িতে থাকি। পড়াশোনায় মন নেই। রোজ বিকেলে অ্যাক্সিডেন্টের লোভে ছাদে উঠে ঘোরাঘুরি করি। ব্যস! আপাতত এইটুকুই।'

ঠিক এইসময় সিঁড়ির কাছ থেকে মা অচ্যুতকে ডাকল।

অচ্যুত ঘাড় ঘুরিয়ে ছাদের দরজার দিকে একবার তাকাল। তারপর হাত

নেড়ে মউলিকে 'টা-টা' করে বলল, 'কাল যদি ছাদে দেখা হয় বেশ হবে...।'

বলেই দৌড়ে চলে গেল ছাদ থেকে।

মউলি অবাক বিষণ্ণ চোখে অচ্যুতের চলে যাওয়া দেখল। ও যেন কতকিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু বলতে পারল না।

সত্যবানস্যারের গুডবয় কথাটা মউলিকে মনে পড়িয়ে দিয়েছিল। তাই আশপাশের অন্ধকার, জঙ্গলের গন্ধ, সব কিছু কেমন ভুলে গিয়েছিল অচ্যুত। ভুলে গিয়ে মউলির কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছিল।

কিন্তু ঝিঁঝিপোকার কান্না, ব্যাঙের ডাক, জোনাকির আলো, সত্যবানস্যারের ঠান্ডা নিশ্বাস, অচ্যুতকে আচমকা ঝাঁপিয়ে ঘিরে ধরল।

স্যারের হাত ধরে ও মাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে চলল। বড়-বড় ঘাস কিংবা জল-কাদা টের পেল কি পেল না।

বেশ কিছুটা যাওয়ার পর ও হেডস্যারের কালো ছায়াটা ঠাহর করতে পারল।

ওকে দেখেই হেডস্যার দু-হাত শূন্যে তুলে নাচের ভঙ্গি করলেন।

সত্যবানস্যার অচ্যুতের ঠিক পিছনে একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়ালেন। তারপর হিসহিস করে বললেন, 'আজ আমাদের জন্ম-জন্মান্তরের সম্পর্ক তৈরি হবে...তেষ্টার সম্পর্ক...রক্তের সম্পর্ক। তারপর...তারপর তুই মুক্তি পাবি।'

অন্ধকারে হেডস্যারের ধূসর ছায়া খিলখিল করে হাসল।

আকাশের তুলো-তুলো মেঘ জায়গায়-জায়গায় ছিঁড়ে গেছে। কয়েকটা দলছুট তারা চোখে পড়ছে। চোখে পড়ছে পালাই-পালাই চাঁদের একটা টুকরো।

প্রবল বাতাসের ঝাপটা হঠাৎই ওদের ঘিরে পাক খেয়ে গেল।

অচ্যুতের চুল উড়তে লাগল। মায়ের কথা মনে পড়ল। বাপির কথা মনে পড়ল। মউলির কথাও।

আর ঠিক তখনই দুটো রক্তপিশাচ অচ্যুতকে ঘিরে নাচ শুরু করল।

অন্ধকারে ওদের সিলুয়েট ছায়ামূর্তিগুলো কীরকম লম্বাটে দেখাচ্ছে। লিকলিকে হাতগুলো আকাশের দিকে তুলে আঙুলে নানারকম মুদ্রা ফুটিয়ে ওরা পাগলের মতো নাচছে...নাচছে।

অচ্যুত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, 'মা...মা...মাগো...।'

ওর বুকের ভেতরটা ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চাইল। ও উবু হয়ে ভিজে মাঠের ওপর বসে পড়ল।

সাপ-খেলানো সুরে হেডস্যার তখন ফিসফিস করে বলছিলেন, 'এ আমাদের বলির নাচ। তোর জীবন আমাদের তেষ্টা মেটাবে। আমাদের পরমায়ু বাড়িয়ে দেবে...।'

অচ্যুত জড়ভরতের মতো ফ্যালফ্যাল করে ওঁদের নাচ দেখছিল। আর শেষ মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছিল।

একটু পরে ওঁরা অন্ধকার মাঠের ওপরে শুয়ে পড়লেন। সাপের মতো বুকে হেঁটে অচ্যুতকে ঘিরে পাক খেতে লাগলেন।

একসময় হেডস্যার গলা উঁচু করে অচ্যুতের ঘাড়ে ঠোঁট ছোঁয়ালেন। অচ্যুত সাপের মুখে-পড়া ব্যাঙের মতো নিশ্চল হয়ে গেল।

ঠিক তখনই ধানকলের মাঠের সীমানায় ফুলঝুরির মতো একটা সাদা আলো ফিনকি দিয়ে জ্বলে উঠল।

প্রথমে একটা।

তারপর আর-একটা।

তারপর একে-একে অসংখ্য।

সাদা, সবুজ, নীল, লাল—নানার রঙের রংমশাল জ্বলে উঠল মাঠের কিনারায়।

কয়েকমিনিটের মধ্যেই মাঠ ঘিরে রংমশালের রঙিন আলোর এক বৃত্ত তৈরি হয়ে গেল।

শ'য়ে শ'য়ে রংমশাল উদ্দাম ফূর্তিতে জ্বলছে। অন্ধকার মাঠে আলোর উৎসব শুরু হয়ে গেল যেন।

'দুর্গাপুজো কি এসে গেছে? নাকি কালীপুজো!' ঝাপসাভাবে ভাবতে চেষ্টা করল অচ্যুত।

ও চমকে তাকিয়েছিল আলোর দিকে। ঝলসানো আলোয় অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে অনেকগুলো মুখ। ঝাঁকে-ঝাঁকে ছেলের দল হাজারো রংমশাল জ্বেলে নতুন এক অকালবোধন শুরু করে দিয়েছে।

সত্যবানস্যার আর হেডস্যারও থমকে গেলেন। ওঁরা চটপট সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালেন। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আলোর রেখার দিকে।

রংমশালের আলোগুলো এবার তিরবেগে ছুটে আসতে শুরু করল ওঁদের

দিকে। আলোর বৃত্তটা তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে ছোট হয়ে আসতে লাগল।

অচ্যুত ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। চোখ কচলে ও ছোট হয়ে আসা বৃত্তটাকে ভালো করে দেখতে লাগল।

অসংখ্য ছেলে, তাদের হাতে জ্বলন্ত রংমশাল—চিৎকার করতে-করতে ছুটে আসছে ওদের দিকে।

একটু পরে চিৎকারটা বুঝে উঠতে পারল অচ্যুত। জিহাদ মিছিলের স্লোগানের মতো ওরা গলায় গলা মিলিয়ে বারবার বলছে, 'রক্তপিশাচ নিপাত যাক! রক্তপিশাচ নিপাত যাক!'

আনন্দে কান্না পেয়ে গেল অচ্যুতের। পুজোয় ও তা হলে মউলির মতো আনন্দ করতে পারবে!

ওই তো কুলদীপ! ওই তো সৌরভ! ওই তো বাসব!

সঙ্গে আরও অসংখ্য চেনা-অচেনা মুখ।

হইহই চিৎকার এতক্ষণে একেবারে কাছে এসে গেছে। জায়গাটা আলোয় আলো হয়ে উঠেছে। সত্যবানস্যার আর হেডস্যার ফাঁদে পড়া নেংটি ইঁদুরের মতো ভয়ে এলোমেলো দৌড়চ্ছেন।

অচ্যুত দৌড়ে গেল কুলদীপের কাছে।

কুলদীপ রংমশাল একহাতে সামলে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরল। অচ্যুত ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। এক অদ্ভুত আনন্দের ঢেউ ওর বুকের ভিতরে উথলে উঠে ওকে একেবারে ভাসিয়ে দিল।

আর ঠিক তখনই কয়েকশো জ্বলন্ত রংমশাল ছুটন্ত সত্যবানস্যার আর হেডস্যারকে ছুঁয়ে ফেলল।

রক্ত-হিম-করা এক ভয়ংকর আর্তনাদ ধানকলের মাঠের আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দিল। দপ করে জ্বলে উঠল দুই পিশাচের অভিশপ্ত শরীর। ওদের শরীরের ধুনি থেকে কালো ধোঁয়ার গাঢ় কুণ্ডলী পাক খেয়ে উঠতে লাগল আকাশের দিকে।

সবাই মুখ তুলে সেই ধোঁয়ার দিকে দেখতে লাগল।

রংমশালের আগুন নিভলে অন্ধকারে কয়েকটা টর্চ এদিক-ওদিক জ্বলে উঠল। দেখা গেল দুই পিশাচের তালগোল পাকানো মৃতদেহ জড়াজড়ি করে পড়ে আছে। দুটো সাপবাজির ট্যাবলেট পাশাপাশি পোড়ানোর পর যেরকম দশা হয় অনেকটা সেইরকম।

আকাশে ভেসে যাওয়া কালো ধোঁয়া কুণ্ডলী থেকে তখনও আর্তকান্না শোনা যাচ্ছে।

সৌরভ, প্রতীক আর বাসব অচ্যুতকে একেবারে জাপটে ধরল।

অচ্যুতের চোখের জল বাধ মানছিল না। কাঁদতে-কাঁদতেই ও বলল, 'তোরা আমাকে এত ভালোবাসিস।'

কুলদীপ হাতের মাস্‌ল ফুলিয়ে বলল, 'এসবের জন্যে কত কাঠ-খড় পোড়াতে হয়েছে জানিস! রাজীবের মাম্মি পাঁচ হাজার টাকা দিয়েছেন রংমশাল কেনার জন্যে। পাড়ার দোকানে পাওয়া যায়নি—তাই বাজির আড়তে যেতে হয়েছে।'

আবেগে অচ্যুত কোনও কথা বলতে পারছিল না। ও কুলদীপের গালে একটা চুমু খেল।

এমন সময় কে একজন ওদের কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, 'বলেছিলাম না, বীতিহোত্র!'

ওরা পাঁচজন অন্ধকারেই হেসে উঠল। তারপর কী ভেবে অমিয়স্যারকে টিপ-টিপ করে প্রণাম করে ফেলল।

অমিয়স্যার অচ্যুতকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তুই শুধু যে ভালো ছেলে তা নয়—অসাধ্বসও বটে!'

বাসব জিগ্যেস করল, 'অসাধ্বস মানে কী, স্যার?'

অমিয়স্যার হেসে বললেন, 'এও জানিস না। অসাধ্বস মানে হল সাহসী, শঙ্কাহীন।'

অচ্যুত চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল। ওর শরীরটা সামান্য কেঁপে-কেঁপে উঠছিল। অমিয়স্যারের 'ভালো ছেলে' কথাটা থেকে ওর 'গুড বয়' মনে পড়ল। তারপর 'গুড বয়' থেকে 'অ্যাক্সিডেন্ট'। আর সবশেষে 'অ্যাক্সিডেন্ট' থেকে একজনের কথা মনে পড়ে গেল।

ওকে এবার সব খুলে বলতে হবে।



...আর সবশেষে 'অ্যাক্সিডেন্ট' থেকে একজনের কথা মনে পড়ে গেল। ওকে এবার সব খুলে বলতে হবে।